লেখা আমাকে ধাওয়া করে

অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় ব্রাত্য বসু

(১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসুর সঙ্গে আলাপচারিতায় উপস্থিত ছিলেন ব্রাত্যজন নাট্যপত্রের সহযোগী সম্পাদক অরিন্দম ঘোষ এবং অন্যলেখ পত্রিকার সম্পাদক সৌমী সেন ও দেবাশিস রায়)

দেবাশিস রায় : নমস্কার। 'অন্যলেখ' পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা আজ এক আড্ডায় মিলিত হয়েছি। আজ আমাদের মধ্যে পেয়েছি প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব, চলচ্চিত্রকার, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, ঔপন্যাসিক, কবি এবং সর্বপোরি মঞ্চ ও সিনেমার অভিনেতা ব্রাত্য বসুকে। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তাঁর লেখা দুটি উপন্যাস — 'অদামৃতকথা' এবং 'দ্যূতক্রীড়ক' সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর একটি আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে ওঁর কাছ থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করব। 'আমরা' বললাম এই কারণে, এখানে এই আলাপচারিতায় আমার সঙ্গে অংশ নেবেন ব্রাত্যজন নাট্যপত্র-এর সহযোগী সম্পাদক, নাট্যশিল্পী এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অরিন্দম ঘোষ। এছাড়া আছেন 'অন্যলেখ' পত্রিকার সম্পাদক সৌমী সেন।

মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা ওঁর (ব্রাত্য বসু) সাহিত্যজীবনের শুরুটা সম্পর্কে পাঠকদের আলোকপাত করতে চাই। আমরা ওঁর ছাত্রজীবনের বিভিন্ন লেখালিখি ব্যতিরেকে প্রথম যে নাটকটি সম্পর্কে জানতে পারি, তা হল ১৯৯৪-তে পিটার শ্যাফার-এর 'ফাইভ ফিঙ্গার এক্সারসাইজ' অবলম্বনে 'ওরা পাঁচজন'। তবু এ নাটক রচনার আগে নিশ্চয়ই ওঁর আরও অনেক কাজ আছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা ততটা জানি না, যাকে বলা যেতে পারে নাটক রচনা শুরুর আগের সলতে পাকানোর কাজ।

(ব্রাত্য বসুকে) আমরা জানি যে কবিতার প্রতি আপনার প্রথম থেকেই গভীর অনুরাগ ছিল এবং চর্চাও ছিল। জীবনানন্দ দাশ আপনার কাছে অন্যতম অনুপ্রেরণা এও জানি। আমরা চাই আমাদের আজকের আলাপচারিতার সূচনা হোক ১৯৯৪-এর আগের সেই সময়কে জানার মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ যখন থেকে শুরু হয়েছিল আপনার কবিতা লেখা, সাহিত্যনির্মাণ ইত্যাদি।

ব্রাত্য বসু : সকলকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রথমেই বলা দরকার যে 'ওরা পাঁচজন' নাটক লেখার আগে অন্য নাটকও লেখার চেষ্টা করেছি। আমার মনে পড়ছে সুকুমার রায়-এর গল্প 'দ্রিঘাংচু'-র একটা নাট্যরূপ দিয়েছিলাম। নাটকটি আমি আমার নাট্যদলের ঘরে পাঠও করেছিলাম। নাটকটির মধ্যে এক ধরনের পলিটিক্যাল পার্টস্ ছিল। কিন্তু আমার ধারণা এই নাটক অভিনয় করতে গেলে দশ ঘণ্টার মত সময় লাগত। মানে এত বড় হয়ে গিয়েছিল নাটকটি। অনেকদিন সে নাটকটি আমার কাছে রাখা ছিল। পরে অবশ্য সেটি হারিয়ে যায়। এই সময়কালে জন মিডলটন সিঙ্গে-এর নাটক 'ইন দ্য শ্যাডো অফ দ্য গ্লেন', 'প্রচ্ছায়া' নামে অ্যাডাপ্ট করেছিলাম। তবে সেটি 'ওরা পাঁচজন'-এর আগে কি পরে তা এখন আর মনে নেই। এছাড়াও ওই সময়ে কিছু লেখালিখি করেছিলাম। হ্যাঁ, কলেজে থাকাকালীন কবিতার প্রতি খুবই আকর্ষণ তৈরি হয়। কারণ কলেজে সেই সময়ে আমাদের চারপাশে যারা ছিলেন তারা মূলত কবি। আবার অনেকে কবির থেকেও বেশি মাতাল। কিন্তু অনেকেই যথার্থ কবি। তবে শুধুমাত্র জীবনানন্দই যে আমার প্রধান অনুপ্রেরণা এমনটা সম্ভবত আমি কোথাও বলিনি।

দেবাশিস রায় : আপনার লেখার মধ্যে আমরা একজনের সন্ধান পাই যাঁর নাম সৌম্য দাশগুপ্ত। তাঁর সংস্পর্শে এসে নাকি আপনার কবিতার প্রতি অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পায়?

ব্রাত্য বসু : সৌম্য দাশগুপ্ত সেই সময়ে আমার বিশেষ বন্ধু। আমার পাড়াতেই থাকতেন। এখন আমেরিকায় থাকেন। তিনি একজন কবি এবং তাঁর লেখা এখনও বেশ সমাদৃত হচ্ছে। সৌম্য আমার থেকে মাত্র দু-বছরের বড়। তখন থেকে দাদা বলে সম্বোধন করতাম আজও করি। এখন তার সঙ্গে পরিচয় হলে নাম ধরেই ডাকতাম। ছোট বয়স থেকে আলাপ। আমি যখন টেন-ইলেভেনে পড়ি তখন ও ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। তখন থেকেই সেভেনটিজ-এর যাঁরা প্রতিষ্ঠিত কবি তাঁদের কবিতাগুলি এনে উনি আমাকে পড়াতে শুরু করেন। প্রথমদিকে ওঁর বাড়িতে আমার হানা দেওয়ার মূল কারণ ছিল ওঁর পয়সায় সিগারেট খাওয়া যেত। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু ওই সময় থেকেই কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রচুর চর্চা ও আলোচনা হত। সেভেনটিজ-এর যত বিখ্যাত কবি আছেন, জয় গোস্বামী থেকে শুরু করে সুবোধ সরকার, মৃদুল দাশগুপ্ত, ভাস্কর চক্রবর্তী...

দেবাশিস রায় : বীতশোক ভট্টাচার্য...

ব্রাত্য বসু : বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা আমি আগেই পড়েছি কারণ তিনি আমার বাবার ছাত্র ছিলেন। তাঁর কবিতা আমি আগেই বাড়িতে পেয়েছি। এছাড়াও সিনিয়র কবি, রমেন্দ্র কুমার আচার্যচৌধুরী, দেবীদাস আচার্য এদের সবার কবিতাই আমি সৌম্য দাশগুপ্তের সঙ্গে পড়েছি। তবে এঁদের কবিতার বইও আমার বাড়িতে ছিল। আমার বাড়িতে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব কবিরই শ্রেষ্ঠ কবিতার বই ছিল, শক্তি চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত। আমি মলয় রায়চৌধুরীর কবিতাও সেসময় পড়েছি। অন্য কবিদের সম্পর্কে জেনেছি। সেভেনটিজের কবিতার যে এক্সপোজার বা অন্য রকম লেখার যে এক্সপোজার সে সম্পর্কেও জেনেছি। মোদ্দা কথা একটা কবিতার বৃত্তের মধ্যে আমি ঘুরছিলাম। সৌম্য

যে কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়তেন সেই কলেজেই আমি ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই। কলেজের ক্যান্টিনে এবং সর্বত্রই আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এবং আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখনই সেই বিখ্যাত 'শত ঝর্ণার ধ্বনি'-র সব আয়োজন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, নির্মল হালদারের কবিতা, কালীকৃষ্ণ গুহের কবিতা নিয়ে তখন আমাদের নিয়মিত চর্চা হচ্ছে। ওই কলেজের পরিমণ্ডলেই আলাপ হচ্ছে বহু কবির সঙ্গে। ফলে কবিতাপাঠ, তার চর্চা এবং আলোচনার একটা বড় জগৎ নিশ্চয়ই আমার সেই সময়ে ছিল এবং সেই সময় খুব ভাল কেটেছে। এছাড়াও দু'জন খুব বিশিষ্ট কবি আমার ক্লাসেই ছিলেন যাঁদের একজন হলেন অচ্যুত মণ্ডল আর একজন হলেন তন্ময় মৃধা। এঁদেরকে এইট্টিজ-এর কবিই বলা যেতে পারে। আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে আসতেন প্রবীর দাশগুপ্ত। তিনি ছিলেন যাদবপুরের ছাত্র। কবি হিসেবে তখনই তাঁর বেশ সুনাম। এছাড়াও ছিলেন অভীক মজুমদার। তিনিও ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমাদের বন্ধু। এই তন্ময় আর প্রবীর কবি হিসেবে বেশ নাম করেছিল। ওদিকে অচ্যুত শুধুমাত্র কবি ছিলেন না। ওঁকে বলা যায় একজন তাত্ত্বিক কাল্ট। ওঁর কাছে অনেক কমবয়সি ছেলেরা আসতে ভালবাসত। ভালবাসত ওঁর কথা শুনতে। আমরাও আড্ডা মারতাম। কবিতার সঙ্গে একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল। কিন্তু নব্বই সালে আমি যখন থার্ড ইয়ারে পড়ছি এবং এর পরপরই এম.এ. পড়ার জন্য আমার কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে চলে যাবার কথা, এমনই একটা সময়ে আমি কলেজে পড়তে পড়তেই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হই। আমার ফোকাসটা কবিতার থেকে ক্রমশঃ থিয়েটারের দিকে সরে যেতে থাকে। আমি কলেজে থাকতে থাকতেই অভিনয় করতে শুরু করি। আর অভিনয় করতে আমি বরাবরই ভালবাসতাম। আমার পাশে যিনি বসে আছেন, অরিন্দম ঘোষ, তাঁর সঙ্গে আমি কলেজে পড়াকালীন একটি মূকাভিনয়ের কোর্স করতেও গিয়েছিলাম। তখনই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ।

দেবাশিস রায় : কবিতা নিয়ে আপনি যতটা ওই সময়কালে চর্চা করেছেন, ঠিক ততটা পাঠাভ্যাস বা চর্চা কি আপনার গল্প, উপন্যাস বা অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ছিল?

ব্রাত্য বসু : খুবই ছিল। সবচেয়ে বড় কথা আমার বাড়িতে গল্প উপন্যাস বা সমস্ত রকম বইয়ের একটা বড় খনি ছিল। আমার মনে আছে, মঁপাসার ছোট গল্পের অনুবাদ আমি ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ে ফেলেছি। আন্তন শেখভ বা ও হেনরির গল্পও তখন আমি পড়ে ফেলেছি। ক্লাস সেভেন-এইটে হেনরি মিলার অনুবাদে পড়েছি। এর পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যও পড়ছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কম বয়সে পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'গোরা' কম বয়সে বুঝতাম না। পরের দিকে গিয়ে ওগুলো সবিস্তারে পড়েছি। তারপর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং একই সঙ্গে তখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু এদের গল্প আমাদের বাড়িতে সংগ্রহের মধ্যে ছিল। সেগুলোও পড়ছি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন বই বাবাকে উপহার দিতেন। সেই সময়ে আমার

মনে আছে, আমি সিক্সে পড়ি বোধ হয়। আমার কাছে একটা বই এল। বইটির নাম ছিল 'ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক'। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদ। আমি এই বইটি সেই সময়ে কতবার যে পড়েছিলাম তার কোন ইয়ত্তা নেই। তারপর 'সাধু কালাচাঁদ'। ওঁরই তৈরি করা চরিত্রে নির্মিত গল্প প্রত্যেক বছর দেব সাহিত্য কুটিরের পুজোসংখ্যায় থাকত। সেই সময়ে আমাদের বাড়িতে পুজোসংখ্যাও রাখা হত। শিশু সাহিত্য, কিশোর সাহিত্য আমাদের বাড়িতে খুবই আসত। কিন্তু ওই কম বয়সে সেই সব সাহিত্যের থেকে নিষিদ্ধ উপন্যাস বা গল্পের প্রতি আমার আগ্রহ কিঞ্চিৎ বেশি ছিল। এটিও কমবেশি সত্য।

দেবাশিস রায় : হ্যাঁ সত্তরের দশকে প্রতি পুজোয় দেব সাহিত্য কুটির থেকে একটি মোটা সংখ্যা প্রকাশিত হত। আর এক এক বছর এক এক নামে সেই বইগুলি প্রকাশিত হত। কোনও বছর নাম থাকত 'পুরবী'। কোনোবার থাকত 'পুজোর উপহার'।

অরিন্দম ঘোষ : সুন্দর নাম — 'তপোবন', 'মণিহার'.....

ব্রাত্য বসু : কোনওবার থাকত 'বলাকা', 'উদ্বোধন'।

দেবাশিস রায় : আশির দশকে যে সব গল্প উপন্যাস লেখা হচ্ছে সেগুলোর সঙ্গেও কি আপনার তেমনই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠছে?

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ। গল্প উপন্যাস বা যে কোনও সাহিত্যের সঙ্গে কোনও সময়ের জন্যই আমার সম্পর্কচ্যুতি ঘটেনি।

দেবাশিস রায় : ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৯৪ সালের পর থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ প্রবলতর হয় এবং ১৯৯৬ সালে আপনি আপনার সেই বিখ্যাত নাটক 'অশালীন' লেখেন। এরপর থেকে আপনি ধারাবাহিকভাবে নাটক লিখে গেছেন। 'অরণ্যদেব', 'মুখোমুখি বসিবার', 'তিস্তা' 'কালান্তক লালফিতা', 'চতুষ্কোণ', 'সতেরোই জুলাই', 'শহর-ইয়ার' ইত্যাদি। এরপর দেখা যাচ্ছে, ২০০৩-এ এসে আপনি একটি গল্প

লিখছেন যা প্রকাশিত হচ্ছে আনন্দবাজার পত্রিকায়। ২০০৭-এ আর একটি গল্প আনন্দবাজারে প্রকাশিত হচ্ছে। তারপর ২০১১ বা ২০১২ সাল হবে হয়ত, যখন আপনার তিন নম্বর গল্পটি প্রকাশিত হয় শোভন গুপ্তের সম্পাদনায় 'অভিনয়ের গল্প' নামক একটি সংকলন গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে আমি আমার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে একটা কথা বলতে চাই যে এমনটা অনেক সময়ে খুব প্রতিষ্ঠিত অনেক গল্পকারের ক্ষেত্রে দেখা যায় বা আজকের সময়ের অনেক প্রতিষ্ঠাপিয়াসী গল্পকারের ক্ষেত্রে দেখা যায় — তাঁরা ক্রমশঃ উপন্যাস লেখার দিকে নিজেদের নিয়োজিত করেন। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে ২০০৩, ২০০৭ বা ২০১১-২০১২-তে যখন আপনার গল্পগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, এরই মাঝে মাঝে আপনি নাটক লিখছেন 'ভাইরাস-এম', 'বাবলি', 'পেজ ফোর', 'রুদ্ধসংগীত', 'বিকেলে ভোরের সর্ষেফুল' ইত্যাদি। এই সময়ে উপন্যাস লেখার কি কোন ভাবনা আপনার ছিল?

ব্রাত্য বসু : একদমই ভাবনা ছিল না। তবে কোনও না কোনও সময়ে আমি উপন্যাস লিখব, এমন একটা সুপ্ত বাসনা মনে মনে আমার ছিল। আর যে গল্পগুলি প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণ আপনি দিলেন তার প্রত্যেকটিই ছিল ফরমায়েশি লেখা। আর এখন এই যে উপন্যাস আমি লিখছি সবটাই নিজের তাগিদে। আমার যে থিয়েটার জীবন, সেই জীবনটাকে বুঝতে গিয়ে আমার মনে হল অতীতের দিকে তাকানো দরকার। সেই তাকানোর সূত্র ধরে আমি প্রথমে 'অদামৃতকথা'-র কাছে গেলাম, তারপর পৌঁছোলাম 'দ্যূতক্রীড়ক'-এ। এখন আমি 'উদ্বাসিত মান্দাস'-এ আছি।

দেবাশিস রায় : এই উপন্যাসটি যখন আপনি লেখা শুরু করছেন, তখন আপনি নাটকে অভিনয় করার কাজও তেমনভাবে করছেন না, নাট্য পরিচালনার কাজেও তেমনভাবে নেই। তার মানে নাট্যে অভিনয় বা পরিচালনার জন্য যতটা শরীরকে নিয়োজিত করতে হয় ততটা করতে হচ্ছে না। তেমনই এক সময়কালে আপনি 'অদামৃতকথা' লিখতে শুরু করলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই উপন্যাস লেখার জন্য সময় পাওয়াটাকে কি আপনি একটা সমাপতনও বলবেন?

ব্রাত্য বসু : একদমই না। প্রথমত, 'অদামৃতকথা' 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করছে ২০২১-এর মে-জুন মাস নাগাদ। অর্থাৎ কোভিড সংক্রমণের প্রকোপ বেশ খানিকটা কমার পরে। আমি কোভিডকালে ঘরবন্দী হওয়ার সূত্রে অনেকটা সময় পেয়ে গেছিলাম। অন্য বিভিন্ন লেখালিখির পাশাপাশি উপন্যাসটি লেখার তাগিদ অনুভব করি। প্রথম অবস্থায় উপন্যাসটি একটি ফরমায়েশি লেখা হিসেবেই এসেছিল শারদীয়া সংখ্যার জন্য। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখলাম লেখার আকার বেশ বড় হয়ে গেল। ফলে শারদীয়া সংখ্যায় স্থান সংকুলান 'সংবাদ প্রতিদিন' করতে পারলেন না। তাই ওঁরাই সিদ্ধান্ত নিলেন যে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রতি রবিবার ওই কাগজেই প্রকাশিত হবে। তবে উপন্যাস লেখার বাসনা যে আমার ছিল তা তো আমি আগেই বললাম।

দেবাশিস রায় : উপন্যাসের মূল বিষয়ে প্রবেশ করার আগে আমি নিছক কৌতুহলবশত একটা প্রশ্ন করতে চাই, যেহেতু প্রথমে 'অদামৃতকথা', তারপরে 'দ্যূতক্রীড়ক' আর এখন 'উদ্বাসিত

মান্দাস' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা যাঁরা আগে উপন্যাস দুটি পড়েছি বা এখন যাঁরা 'উদ্বাসিত মান্দাস' পড়ছি, তারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি যে 'দ্যূতক্রীড়ক'-এর ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়কালকে ধরা হয়েছে। আমরা সাধারণভাবে জানি যে যখন বিশেষ কোনও একটি সময়কালকে ধরে কোনও কিছু রচিত হয় তখন হয় সেই সময়কালে যিনি প্রধান ব্যক্তিত্ব তাঁকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে রেখে রচনাটিকে নির্মাণ করা হয় বা শুধুমাত্র সেই সময়কালের ওপরই আলোকপাত করা হয় কোনও চরিত্রকে প্রাধান্য না দিয়ে। 'দ্যূতক্রীড়ক'-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সেখানে ওই সময়কালের প্রধান চরিত্র হিসেবে শিশিরকুমার ভাদুড়ি কে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে এবং 'উদ্বাসিত মান্দাস' যেহেতু 'দ্যূতক্রীড়ক'-র এক সম্প্রসারণ, ফলত সেখানেও অনিবার্যভাবে শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রধান ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত। অথচ 'অদামৃতকথা'-র ক্ষেত্রে আমার স্বভাবতই মনে হচ্ছে যে সেখানে গিরিশচন্দ্র ঘোষই ওই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু সেখানে দেখা গেল ওই সময়কালের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্রকে নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। আমার মনে হয়েছে এটা যেন বাইশ গজের একটি ক্রিকেট পিচ যার দুই প্রান্তে দুই ব্যাটসম্যান অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল দাঁড়িয়ে আছেন। আর ওই দুই ব্যাটসম্যানের ব্যাটিং নৈপুণ্যে এবং পিচের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারদের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠছে উপন্যাসটি। আমার প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন কেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ?

ব্রাত্য বসু : এখানে সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর ওই সময়কালকে বলার জন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষকে কেন্দ্র করে সর্বাঙ্গীণ বহু সাহিত্যনির্মাণ হয়েছে। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখরকে নিয়ে লেখার ইচ্ছে আমার বরাবরই ছিল, কারণ আমি মনে করি অর্ধেন্দুশেখর ওই সময়কালের অন্যতম বড় প্রতিভা। অর্ধেন্দুশেখরের জীবন, তাঁর বোহেমিয়ান কার্যকলাপ, জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁর হঠকারি সিদ্ধান্ত, তিনি নিজে যাঁর বাড়িতে আশ্রিত তাঁদেরই না জানিয়ে ব্যঙ্গ করে থিয়েটার করে আর্থিক অনিশ্চয়তায় জড়িয়ে পড়া, থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার মধ্যে দিয়ে গোটা পরিবারকে প্রায় অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে দেওয়া, মাঝে মাঝে থিয়েটার চলতে চলতে ভিনদেশে চলে যাওয়া, এ সবটা মিলে অর্ধেন্দুশেখরের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। সব মিলিয়ে উনি আমার খুবই প্রিয় নট। এসব কারণে অর্ধেন্দুশেখরই আমার উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র হয়ে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখরকে নিয়ে পড়াশুনো করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম অমৃতলাল বসু এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি দুজনেই বিভিন্ন সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। পারফর্মেন্সের ক্ষেত্রেও আমার মনে হয়, পারফর্মেন্স করতে গিয়েও আমরা মঞ্চে দেখি, সেখানে অভিনয় করতে করতে একটা ডিজায়ার তৈরি হয় পরস্পরের মধ্যে যেখানে নারীপুরুষের কোন ভেদাভেদ থাকে না। যাত্রাজগতে বহু নটের ক্ষেত্রে এমন ডিজায়ার তৈরি হওয়ার কথা আমি অনেক শুনেছি। আর যেহেতু ওঁদের জীবনে উইমেন সোলের (soul) সংস্পর্শ কম, ফলে ওই ডিজায়ারটা ওঁদের মধ্যে ছিল। আর এই বিষয়টা অর্ধেন্দুশেখরের সূত্রে অমৃতলালের মধ্যে এমনভাবে মিশে আছে যে আমি আমার উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা রিলেট করেছি।

আর আপনি যেহেতু ক্রিকেটের উদাহরণ দিলেন তাই আমিও বলতে পারি; অর্ধেন্দুশেখর হচ্ছেন চর্তুদিকে স্ট্রোক নেওয়া ব্যাটসমান আর অমৃতলাল হচ্ছেন তাঁর অপরিহার্য রানার। এমনভাবেই উপন্যাসে তাঁদের সাজানো হয়েছে।

দেবাশিস রায় : মহৎ সাহিত্যের তো অনেকগুলি মাত্রা থাকে, অনেকগুলি স্তর থাকে যা সমস্ত টেক্সটের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে। সেটা অবশ্য কেউ গ্রহণ করতেও পারেন নাও করতে পারেন। কিন্তু একটা বিষয়ের কথা আমি এখানে রেফার করতে চাইছি।

আমার কথা হচ্ছে যে, বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে বলতে গেলেই বলা হয় যে, ১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে দিয়ে পেশাদারি নাট্যাভিনয় শুরু হয়। শুরু হলেও তার নির্মাণ প্রক্রিয়া কিন্তু আরও আগেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আপনার উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে জানতে পারি যে ওই জানাটা সঠিক নয়। ১৮৬৮-১৮৬৯-এ এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত যে চতুষ্টয়ের কথা আপনি বলছেন, তাঁরা হলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র নিয়োগী, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এবং ধর্মদাস সুর। এবং বাইরে থেকে অনেক সময়েই আরও একজন নট — গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর একটা প্রণোদনা আমরা দেখতে পাই। এই সময়কালে যে যে নাট্যাভিনয়গুলি হচ্ছে তার মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী', 'সধবার একাদশী' অন্যতম। এখানে আমার মনে হয় যে এই সময়েই একটা অন্য ন্যারেটিভ তৈরি হয়ে গেছে। অথচ এই ইতিহাসের কথা কিন্তু বাংলা থিয়েটারে কখনও আলাদাভাবে গ্লোরিফাই করা হয়নি। ১৯৭২ সালের 'নীলদর্পণ'-এর ইতিহাসই আমরা এতদিন জানতাম, তার আগের পর্বটি নয়।

ব্রাত্য বসু : প্রসেনিয়াম মঞ্চে পেশাদারি থিয়েটারের জন্ম কিন্তু হচ্ছে, গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফের (রাশিয়ান স্কলার, অভিযাত্রী, ভাষাবিদ) 'দ্য ডিসগাইজ'-এর (ছদ্মবেশী) মাধ্যমে। কারণ লেবেদেফই বুঝতে পারেন যে, যেহেতু কলকাতা শহরে ইংরেজরা রয়েছেন, এখানে নানাধরনের ট্যাভার্ন (tavern) গড়ে উঠেছে, রেসকোর্স গড়ে উঠেছে, নতুন পানশালা আছে, সাহেবরা নানাপ্রকার বিনোদন করছে — বিনোদনের জন্য ইংরেজরা পরপর থিয়েটার করছে। সেই থিয়েটারে শুধুমাত্র সাহেবদেরই প্রবেশাধিকার। আর লেবেদেফ যেহেতু একজন দো-আঁশলা সাহেব, সেহেতু উনিই অনুভব করলেন যে এখানে যদি স্থানীয় ভাষায় থিয়েটার নির্মাণ করা যায়, তাহলে নতুন ধরনের ব্যবসা শুরু করা যাবে। এও বুঝলেন যে সেই নাট্যনির্মাণ যদি নেটিভদের দেখানো যায়, তাহলে তাদের মধ্যে প্রবল আগ্রহের জন্ম দেবে। কারণ সাহেবদের থিয়েটারে যেহেতু নেটিভদের প্রবেশাধিকার নেই, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের সেই থিয়েটার সম্পর্কে কৌতূহলও বেশি। তাদের প্রবেশাধিকার নেই বলে তারা জানেই না ওই বিনোদনের প্রকৃত চেহারাটি কি? লেবেদেফ বুঝেছিলেন — নেটিভদের ভাষায় থিয়েটার জনপ্রিয় হবেই। নেটিভরা বুঝতে চাইবে, দেখতে চাইবে সেই থিয়েটার যার আস্বাদ তাদের কাছে নেই। এছাড়া কলকাতা শহরে খেউড়, তরজা, পারফর্মেন্স ইত্যাদির ঐতিহ্য ছিলই। যদিও কলকাতা শহরে তখন তা অনেকটা অবক্ষয়িত রূপ নিয়েছিল। মানে যে কোন আরবানাইজেশনে, যে কোন নাগরিক সংস্কৃতির শুরুতে

যেমনটা থাকে। তাকে রিফাইন করতে করতে যেতে হয়। শুরুতে যে কাঁচা অবস্থাটা ছিল সেটা লেবেদেফ থিয়েটার করতে গিয়ে ভাবলেন যে ওইটাকেই আমরা বিক্রি করব এবং তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় টাচ মেশাব। তারপরেই ওই 'দ্য ডিসগাইজ' প্রযোজনা তৈরি হয়। ওই সময়ে দুটি প্রযোজনা হয়। একটা ছিল — রিচার্ড পল জডরেল-এর 'দ্য ডিসগাইজ' নাটক। বাংলা নাম ছিল — 'কাল্পনিক সংবদল'। আরেকটি হল, মঁলিয়েরের নাটক 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' (লামোর মেদস্যাঁ)। এই যে পারফর্মেন্স ঢুকে পড়ল, তারপর থেকে বিভিন্ন রকম মেটা-ন্যারেটিভের জন্ম হতে লাগল। ক্রমশ দিন যত এগোল পুঁজি ফোয়ারার মত আরও বাড়তে শুরু করল কলকাতা শহরে। বাবুশ্রেণীর জন্ম হল। বাবুশ্রেণীরা যখন ভাবতে শুরু করল যে তারা আর্থিক দিক থেকে সাহেবদের শুধুমাত্র সমতুল্য নয়, কেউ কেউ সাহেবদের তুলনায় বেশি সম্পন্ন। কিন্তু জাত হিসেবে নয়, বর্ণজনিত কৌলিন্যের মাপকাঠিতে তারা ছিল ব্রাত্য। সাহেবদের থিয়েটারে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। তখন তারা নিজেদের বিনোদনের জন্য নিজেদের বাড়িতে থিয়েটার করতে শুরু করল। কিন্তু সে থিয়েটারও ছিল রেস্ট্রিক্টেড। সেখানে শুধুমাত্র অভিজাত পরিবারের মানুষজনের প্রবেশাধিকার ছিল। সাহেবরাও সেখানে থিয়েটার দেখতে আসতেন এবং আসতেন কলকাতা শহরে নতুন তৈরি হওয়া কিছু সাময়িকপত্রের সাংবাদিকরা। তখন বাবুদের বাড়িতে যাঁরা অভিনয় করছেন তারা মূলত মিড্‌ল্ ক্লাস। যেমন কেশব গাঙ্গুলি, তিনি ছিলেন হেড আপিসের বড়বাবু। এই অভিনয়ের সূত্রেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির কতিপয় অংশ জমিদার বাড়িতে প্রবেশাধিকার পেল। এবং তাদের প্রবেশাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা মধ্যবিত্ত দর্শকও তৈরি হতে শুরু করল। কিন্তু সেখানে সব ধরনের দর্শক ঢুকতে পারছে না। অর্ধেন্দুশেখর এমনই একটা রাজবাড়িতে অভিনয় করতেন, সেখানে তাঁর অভিনয় করতে ভাল লাগত না। কারণ তিনি তাঁর অভিনয় নিজস্ব শ্রেণির দর্শকদের দেখাতে পারছেন না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তখনও চাকরি করছেন। তিনি তাঁর অঞ্চলে মূলত একজন ইন্টেলেকচ্যুয়াল, তাত্ত্বিক মানুষ বলে পরিচিত। থিয়েটার বিষয়ে তাঁর বেশ খানিকটা জ্ঞান আছে বলে অনেকেই জানেন। তিনি তখন প্রায়শই যাত্রায় অভিনয় করেন তাঁর সেই বাজখাঁই কণ্ঠ নিয়ে। পরশুদিন পড়ছিলাম, শিশিরকুমার ভাদুড়ি নিজে বলছেন যে — 'গিরিশবাবুর মত গলা আর কারুর ছিল না। দাপুটে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল সেই কণ্ঠস্বর। উচ্চারণে খানিক সমস্যা থাকলেও কণ্ঠস্বরে তাঁর সমতুল্য ওই সময়ে কেউ ছিলেন না। 'মন্ত্রী'-কে 'মন্‌তি' উচ্চারণ করতেন তিনি। র-ফলা অনুপস্থিত থাকত। উচ্চারণ আমার ভাল ছিল ঠিকই কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাঁর জায়গায় আমার পৌঁছনো সম্ভব ছিল না।'

তখন অর্ধেন্দুশেখরকে রাজবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নগেন্দ্রনাথকে তখন জোড়াসাঁকোয় দর্শক হিসেবে ঢুকতে দেওয়া হল না। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা ভাবলেন যে থিয়েটার দেখার জন্য মধ্যবিত্ত টিকিট কাটা দর্শক তৈরি করা হোক। সেই ভাবে থিয়েটার শুরু হল। ফলে ওই পারফর্মেন্সটা ছিলই। ১৮৭২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর টিকিট বিক্রি করে প্রথম থিয়েটার শুরু হল কিন্তু পারফর্মেন্স বিষয়টা আগে থেকেই গিয়েছিল এবং সেটা ক্রমশ রিফাইন হতে হতে গেছে রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে শুরু

করে দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত। রামনারায়ণ তর্করত্ন হচ্ছেন রাজবাড়ির প্রোডাক্ট। তিনি আবার নাটক লেখার প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হতেন। দীনবন্ধু মিত্রকে ওঁরাই তৈরি করেছেন। মধুসূদন দত্তেরও উত্থান হচ্ছে বাবুদের বাড়ি থেকে। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' বেলগাছিয়া রাজবাড়িতে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এঁরা কিন্তু প্রত্যেকেই মিড্‌ল্ ক্লাস। মিড্‌ল্ ক্লাসের একটা নিজস্ব দাবি তৈরি হচ্ছে।

অরিন্দম ঘোষ : দাবি তৈরি হল এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকশ্রেণীও তৈরি হচ্ছে। খেউড়, বটতলার থিয়েটার ইত্যাদি যেমন ছিল তেমনই মধ্যবিত্তের জন্য যেটা থাকা দরকার সেটা ছিল না।

ব্রাত্য বসু : অতএব সাহেবদের থিয়েটারের রিফিউজ্যাল থেকে তৈরি হয়েছিল বাবুদের থিয়েটার আর বাবুদের থিয়েটারের রিফিউজ্যাল থেকে তৈরি হয়েছিল মধ্যবিত্তের থিয়েটার।

অরিন্দম ঘোষ : যেহেতু থিয়েটার এবং ব্রাত্য বসু দুটি সমার্থক শব্দ, সেহেতু আমরা থিয়েটারের আঙ্গিকে ঢুকে পড়েছিলাম। তাই আমি আবার সেই বিষয়টাকে ঘুরিয়ে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি যেখান থেকে আলোচনাটা শুরু হয়েছিল সাহিত্যের আঙিনায়, দুই উপন্যাসের বিষয় নিয়ে। আমার মনে আছে, সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার 'রোববার' নামক বিশেষ ক্রোড়পত্রে যেদিন 'অদামৃতকথা'-র প্রথম পর্বটা পড়ছি সেদিন উপন্যাসে ভাষার ব্যবহারে চমকে উঠেছিলাম। কী অসাধারণ ভাষার ব্যঞ্জনা! মনে হচ্ছে যেন বঙ্কিমচন্দ্রের টেবিল থেকে লেখাটা বেরোচ্ছে। এবং তারপর যখন পড়তে পড়তে গেলাম, যখন প্রথম পর্বটা শেষ হল তখন বুঝতে পারলাম তার মধ্যেই ভাষার চেহারাটা কেমন যেন খানিকটা বদলে গেল। পরবর্তীতে 'দ্যূতক্রীড়ক'-এ সেই ভাষার চলন আরও বদলে গেল। এবং তখন বুঝতে পারলাম যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাটা বদলাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে যে ভাষার সেই এক্সপেরিমেন্টটাকে আপনি ধরলেন। এবং দুটো উপন্যাসের মধ্যেই খুব সংগত কারণে সেই এক্সপেরিমেন্টটা করলেন। এই দুই উপন্যাসে এই যে গদ্যশৈলীর মধ্যে দিয়ে আপনার যাতায়াত, ভাষা নিয়ে আপনার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সে সম্পর্কে আপনি যদি কিছুটা আমাদের আলোকপাত করেন।

ব্রাত্য বসু : দুটো উপন্যাসের মধ্যে ভাষার যে স্তরান্তর, সেইটা সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে বলি, উপন্যাসটা শুরু হচ্ছে, ১৮৭২ সালে ২৬শে মার্চ কাশীতে। দেখানো হচ্ছে, সেখানে গঙ্গার তীরে 'বুড়ুয়ামঙ্গল' উৎসবে উপস্থিত হচ্ছেন নবীনচন্দ্র এবং অমৃতলাল। এবার ওই যে গঙ্গার তীরে দুটি মানুষ এসে দাঁড়াচ্ছে, এবং তখন যে ভাষা আনা হচ্ছে, তা হল বঙ্কিমচন্দ্রের অনুষঙ্গ। এর মধ্যে আবার শরদিন্দু মিশে যাচ্ছে। আমার সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে আমি যখন উপন্যাসগুলি লিখতে যাচ্ছি তখনই দেখা যাচ্ছে দুটো উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রবলভাবে আসছে সেই সব ভাষার ধরন। তখন আমি ঠিক করলাম যে, ওই সময়টা মানে ১৮৭২ সাল অর্থাৎ তার চার বছর আগে বোধহয় 'বিষবৃক্ষ' লেখা হচ্ছে। সে বছরই বোধ হয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। ১৮৬৪-তে 'দুর্গেশনন্দিনী'। তারপরে 'কপালকুণ্ডলা'। এই সময়কালে এগুলো লেখা হচ্ছে এবং একই সঙ্গে কাউন্টার গদ্যও চলছে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড গদ্যও চলছে বাংলায়। 'আলালের ঘরের দুলাল' লেখা হচ্ছে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' লেখা হচ্ছে। একই

সঙ্গে অভিজাত তৎসম শব্দকন্টকিত এবং যাকে বলে সমাজের উচ্চবর্ণের যে শীলিত ভাষা, যা রামমোহন, বিদ্যাসাগরদের মধ্যে দিয়ে তখন তৈরি হয়েছে। সাহিত্যে তা প্রবলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালির অ্যাকচুয়্যাল যে বর্বরের ভাষা, সে ভাষাও তো প্যারালালি চলছে। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ সেই ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই আমি ঠিক করলাম এই দুটো ভাষার একটা মিশ্রণ আনতে হবে। এবং যত এগোবে মানে অর্ধেন্দুশেখরের পরের চিঠিটা যদি দেখেন, দেখতে পাবেন ওটা রবীন্দ্রনাথের গদ্যের একধরনের মকারি। আমার উপন্যাসে অর্ধেন্দুশেখরের চিঠিটার প্রথম দিকটায় তারই একটা চেহারা দেখা যাবে। এই ধরনটা অনেকে ধরতে পেরেছেন, আবার অনেকে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠির মধ্যে, গদ্যের মধ্যে একটা মজা আছে। সেই ধরনটাকে আমিও সিরিয়াসলি ধরার চেষ্টা করেছি। ওটা আসলে একটা হিউমার। ওইখানে এসে আমার গদ্য পালটে যাচ্ছে।

অরিন্দম ঘোষ : হ্যাঁ, এই পালটে যাওয়ার বিষয়টাই আমি বলতে চাইছি। এই যে একটা ভাষার ধরন থেকে অন্য ধরনে চলে গেল এই কথাই আমি উল্লেখ করতে চাইছি।

ব্রাত্য বসু : মানে — সময় যত পালটাল ভাষাটাও বদলাতে বদলাতে গেল। রবীন্দ্রনাথ যেমন আস্তে আস্তে চলিত গদ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর লেখাকে। কিন্তু উনি টেকনিক্যালি বিশ্বাস করতেন যে উপন্যাস বা ফিকশন সাধু গদ্যেই লিখতে হবে। ওঁর সঙ্গে প্রথম এই ভাষা নিয়ে তর্ক করেন প্রমথ চৌধুরি। প্রমথ চৌধুরি বলেন যে ফিকশন সবসময় চলিত গদ্যেই লেখা উচিত। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরির কথায় কনভিন্সড হন। কিন্তু একসময় তাঁর কাছে সাধু গদ্যই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেত। আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মানে রামকমল ভট্টাচার্যের দাদা যিনি কোঁৎপন্থী ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক, তাঁর সঙ্গে কোনও এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কলহ বাঁধে। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হয়। এর পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবন খুব একলা কাটে। রামকমল আত্মহত্যা করেছিলেন। মানে যিনি 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' লিখেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্যের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে তিনি সেখানে চলিত গদ্যের জন্য সওয়াল করছেন। রামমোহনের যে আরবি ফার্সি ভাষা, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষা এবং তার পরপর বঙ্কিমচন্দ্রের তৎসম শব্দকন্টকিত সাধু গরিমাময় বাংলাভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত ভাষা নিয়ে এক ধরনের চলিত গদ্যের দিকে ধাবিত হওয়া যে বাংলা গদ্য, এই

সবটা তখন চলছে। এই গদ্যের যে টানাপোড়েনগুলো কিন্তু আমার উপন্যাসেও আসছে, আমার প্রথম উপন্যাসের সময়কাল ১৮৭২ থেকে ১৯১৬ আর দ্বিতীয় উপন্যাসের শুরু হচ্ছে ১৯১৬। সেখানে আমরা ফ্লাশব্যাকে যাই, ওঁর বাবার জীবনে ফিরে যাই। শিশিরকুমারের ছোটবেলায় আমরা ফিরে আসি। ১৯১৬ থেকে ১৯৩১ মানে ওঁর ফিরে আসা পর্যন্ত 'দ্যূতক্রীড়ক' আর পরের সময়টা অর্থাৎ ১৯৩১ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত হল 'উদ্বাসিত মান্দাস'। এই লেখাটি আমি সম্প্রতি শেষ করলাম। অতএব যখন আমরা শিশিরকুমার ভাদুড়ি-র 'দ্যূতক্রীড়ক'-এ চলে আসছি তখন তা এই সময়ের গদ্য হয়ে উঠল। সেখানে ওঁর জীবনের সঙ্গে মহানগর জীবনের যে বিবর্তন, সেটাকে আমি ধরার চেষ্টা করেছি তা এই উপন্যাসে প্রবলভাবে এসেছে। 'উদ্বাসিত মান্দাস'-এ তা আরও স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

দেবাশিস রায় : 'দ্যূতক্রীড়ক'-এ উত্তর কলকাতার যে সব গলি এবং রাস্তার বর্ণনা আপনি দিয়েছেন...

ব্রাত্য বসু : এবং সেগুলো ভেঙে নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে তারও একটা ছবি এখানে পাওয়া যাচ্ছে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর বিবর্তন। অর্থাৎ কাইজার স্ট্রীট থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কীভাবে আসছে তার একটা ছবি এখানে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। একটা মহানগরীর সংস্কৃতিকে যদি ধরতে হয়, তাহলে মহানগরকেও ধরতে হবে।

দেবাশিস রায় : এই বিবর্তনের ইতিহাসটা 'অদামৃতকথা'-তেও এসেছে যেখানে আপনি মাঝে মাঝেই বলছেন যে এই প্রেক্ষাগৃহের নাম আগে এই ছিল এখন বদলে এই নাম হয়েছে।

ব্রাত্য বসু : বিডনস্ট্রিট স্টার, তারপর নাম হল এমারেল্ড। তারপর নাম হল কোহিনূর তারপর মনমোহন থিয়েটার।

দেবাশিস রায় : আরেকটা, যে কাঠের মঞ্চটি বানিয়েছিলেন মিনার্ভার কাছাকাছি ধর্মদাস সুর এবং তাঁর সঙ্গীরা। তা হল ৬ নম্বর, বিডন স্ট্রীট।

ব্রাত্য বসু : গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। ওটাই পরে মিনার্ভা থিয়েটার নামে পরিচিত হয়।

দেবাশিস রায় : দুটো উপন্যাসের ক্ষেত্রে সময়কে এবং ভূগোলকে আপনি প্রাধান্য দিয়েছেন।

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ তার প্রয়োজন ছিল। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটছে। একই সঙ্গে উপনিবেশ তৈরি হচ্ছে। উপনিবেশের নানারকম প্রশাসনযন্ত্র তৈরি হচ্ছে। আইন তৈরি হচ্ছে। শিক্ষা বিল কিন্তু তখনও আসেনি। কিন্তু মহানগরের যে সমস্ত আইন-কানুন সেগুলোর আস্তে আস্তে এন্যাক্টমেন্ট হচ্ছে। গদ্যের ক্ষেত্রে এইসবই হচ্ছে মূল ভাবনা।

অরিন্দম ঘোষ : আর একটা বিষয় পাঠকগণ জানতে চাইতে পারেন যে আপনি সুদীর্ঘ সময় ধরে নাটককার হিসেবেই পরিচিত। এত বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক আপনি লিখেছেন, এবং আমি যদি ফিওদর ধরি, যদি তাকে একটা কেন্দ্রীয় চরিত্র ধরি তাহলে তাঁকে নিয়ে আপনি নাটক লিখেছেন। দেবব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে নাটক লিখেছেন। অরবিন্দ ঘোষও আপনার নাটকে এসেছেন।

ব্রাত্য বসু : উনি কিন্তু অরবিন্দ হয়ে আসেননি। খুবই অল্প পরিসরে তাঁকে ধরা হয়েছে 'বোমা' নাটকে।

অরিন্দম ঘোষ : অল্প হলেও তাঁর জীবন খানিকটা উঠে এসেছে সেখানে। তবু 'অদামৃতকথা' উপন্যাসের কথা যদি আমি ধরি, তাহলে আপনি ওই দুটি চরিত্রের মঞ্চে চরিত্রায়ণ না ঘটিয়ে বা বলা যেতে পারে নাটকের যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও আপনি নাটক না লিখে তাঁদের কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখলেন কেন? অথচ যে কোন প্রতিষ্ঠিত নাটককারের এই ধরনের চরিত্রকে কেন্দ্র করে তাঁদের মঞ্চে উপস্থাপন করাটাই স্বাভাবিক প্রবণতা।

ব্রাত্য বসু : উপন্যাসে নিয়ে এলাম এই কারণে — এটার ল্যাণ্ডস্কেপ এত বড় যে তাকে মাত্র দু-ঘন্টার থিয়েটারে আনা যাবে না। এবং এর বিষয়ের মধ্যে আমার যেহেতু অনেক কথা বলার আছে সেটাকে নাটকের ফর্মে আঁটানো যেত না। হ্যাঁ, বিষয়টা নিয়ে হতে পারত চলচ্চিত্র। কিন্তু এই বিষয়কে নিয়ে চলচ্চিত্র প্রযোজনার যে বড় বাজেট তা পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গেলে সেখানে পুরো একটা কলকাতা শহর তৈরি করতে হত একটা বড় স্টুডিও-তে। মানে তখনকার সেই ভাঙাচোরা গ্রে স্ট্রীট, পাথরমোড়ানো রাস্তা, বিডন স্ট্রীটের সামনে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, স্টারের সামনে সেই রাস্তা এসব নতুন করে তৈরি করতে হবে। গ্যাসচালিত লাইটপোস্টের ব্যবস্থা করতে হত। তার থেকে উপন্যাস লিখলেই ভাল।

অরিন্দম ঘোষ : মানে সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট।

ব্রাত্য বসু : প্রেক্ষাপট এবং ওই সময়কাল অর্থাৎ ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৮৩, মানে এরপর আমার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে লেখার পরিকল্পনা আছে। একশো বছরেরও বেশি সময়কাল দুঘন্টার পরিসরে কোনও ভাবেই আনা সম্ভব নয়। বিশেষত যে ল্যাণ্ডস্কেপে সম্পূর্ণ সময় ও ঘটনাকে ধরতে চেয়েছি।

অরিন্দম ঘোষ : খুব বিস্তৃতভাবে ধরতে চেয়েছেন আপনি। আর উপন্যাসের এই বিস্তৃতির জন্য আমরা পাঠকরা এবং একটা বড় অংশের থিয়েটারপিপাসুরা বাংলা থিয়েটারের একটা বড় সময়ের ইতিহাসকে জানতে পারলাম। চলমান ইতিহাসকে পেলাম।

ব্রাত্য বসু : ওই সময়ের লোকগুলোকে দেখতে পাওয়া গেল।

অরিন্দম ঘোষ : অনেক চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

দেবাশিস রায় : অনেক ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেল।

ব্রাত্য বসু : যেমন ভুবনমোহন বা নগেন্দ্রনাথের কথা অনেকেই জানতেন না। নগেন্দ্রনাথ ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে যে মারা যান সেই ঘটনা অনেকের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। বা ভুবনমোহনের ওই ফুটানি ও পরে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার গল্প।

দেবাশিস রায় : বিশেষ করে থিয়েটার প্রোডিউসারদের কথা। তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। বিক্ষিপ্ত নাম উঠে এসেছে কিন্তু তাঁদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা ছিল তাও কিন্তু দারুণভাবে উঠে এসেছে দুটো উপন্যাসের মধ্যে।

দুটো উপন্যাসের পরিক্রমায় একটা দীর্ঘসময়ের ব্যাপ্তি আছে। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন। ১৮৭২ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যা শিশিরকুমার ভাদুড়ির জীবন পরিক্রমায় শেষ হবে

আপনার তৃতীয় উপন্যাস 'উদ্বাসিত মান্দাস'-এর মধ্যে দিয়ে, তারপর কি ইতিহাসটা আরও এগোবে আপনার উপন্যাসে?

ব্রাত্য বসু : ওই যে বললাম। 'উদ্বাসিত মান্দাস'-এর শেষদিকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধায়ের মৃত্যু ১৯৮৩-এ। আমার ইচ্ছে আছে অজিতেশের সম্পূর্ণ জীবনকে উপন্যাসের মধ্যে আনার। দেখা যাক কতটা সম্ভব হবে। তবে নাটক যদি ফুটবলের ছ'গজি বক্স হয়, উপন্যাস সেক্ষেত্রে খোলা মাঠ।

অরিন্দম ঘোষ : 'দ্যূতক্রীড়ক' উপন্যাস অবশ্যই শিশিরকুমার ভাদুড়ি কেন্দ্রিক। 'উদ্বাসিত মান্দাস'-এ এখনও পর্যন্ত যতটুকু পেয়েছি তার মধ্যে শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত, সামাজিক, জীবনের ছবি উঠে এসেছে। উঠে এসেছে তাঁর জীবনের সঙ্গে থিয়েটারের সেইসব অসংখ্য ঘটনাবলি, সুখ-দুঃখ-বেদনার ছবি। আর 'অদামৃতকথা'-তে এসেছে অর্ধেন্দুশেখর এবং অমৃতলালের প্রসঙ্গ। আমার বরাবরই মনে হয় একজন নাটককার বা নাট্যপরিচালক হয়ে অভিনেতাদের আপনি বরাবরই পছন্দ করেছেন। আর সেইজন্যই নট হিসেবে অর্ধেন্দুশেখর এবং অমৃতলালের উৎকর্ষ আপনাকে আকর্ষিত করেছে।

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ হ্যাঁ।

অরিন্দম ঘোষ : কিন্তু গিরিশ ঘোষ সেখানে লতায় পাতায় জড়িয়ে রয়েছেন।

দেবাশিস রায় : একবার ইন্টারাপ্ট করছি। আপনি এক জায়গায় বলেওছেন যে অর্ধেন্দুশেখরকে ছাপিয়ে গিরিশচন্দ্র অনেক এগিয়ে চলে গেল।

ব্রাত্য বসু : কারণ অর্ধেন্দুশেখরের স্বভাববাদী যে অভিনয় তার থেকে গিরিশচন্দ্রের যাত্রা-ঘেঁষা সেই উচ্চকিত অভিনয় সাধারণ লোকে পছন্দ করল। আর গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে সেই ধরনের এলিমেন্ট ছিল। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙে গৈরিশ ছন্দে অভিনয়কে বেঁধে ফেলে যাত্রার প্যাটার্নে এমন এক পৌরাণিক ধরনকে অনুসরণ করলেন যাতে সেই অভিনয়ের মধ্যে একটা দার্ঢ্য ব্যাপার আসে।

অরিন্দম ঘোষ : আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা বাঙালিরা তো 'এ' বনাম 'ও' করতে ভালবাসি। উত্তম-সৌমিত্র কিম্বা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। এখানেও আমরা গিরিশ ঘোষ এবং শিশির ভাদুড়ির মধ্যে এমন তুলনামূলক আলোচনা করতে ভালবাসি বা তুলনা করেও থাকি। আপনি যেহেতু এই উপন্যাস লিখতে গিয়ে খুব নিবিড়ভাবে এই দুই চরিত্রের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হয়েছেন, আপনার এ বিষয়ে কী মনে হয়? এদের দুজনের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচার করলে উৎকর্ষের দিক থেকে কে আপনার মনে নট হিসেবে উচ্চতম স্থানে আসীন?

দেবাশিস রায় : আমার সংযোজন হচ্ছে, সামগ্রিক থিয়েটারের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে নাটককার অভিনেতা এবং নাট্যপরিচালনার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে যদি দুজনের কাজকে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে আপনার দৃষ্টিতে কাকে আপনার অন্যতর বলে মনে হয় তা যদি বিশদে বলেন।

ব্রাত্য বসু : বলা মুশকিল। আমি বিনয় ঘোষের লেখা 'মেট্রোপলিটন মন'-এর কথা মনে করতে পারি। যাদের সম্পর্কে আমি বলব তারা সকলেই হিন্দু কোলাবোরেটর। হিন্দু কোলাবোরেটর মানে যারা সাহেবদের সঙ্গে হাত মেলাল। সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজি ভাষা শিখল। তার সুযোগ সুবিধা নিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হল। এরা ইংরেজি শেখার সুবাদে নানাধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে পারল। সেটা শিক্ষক থেকে শুরু করে করণিক পর্যন্ত। সব ধরনের পেশাই তার মধ্যে ছিল। উকিল হওয়াটা সেই সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। যেমন আগে কলকাতার সমস্ত কোর্টে ফার্সি ভাষায় সওয়াল হত। মুসলমান আধিপত্য যত কমল, ইংরেজ আধিপত্য তত বাড়ল। ১৮৩৫ সালে যে মুহূর্তে মেকলে মিনিট (macaulay minute, a resolution) তৈরি হল তখন থেকেই এখানে ইংরেজি শেখার প্রতি আগ্রহের রমরমা হতে লাগল। ফলে জাগতিকভাবে প্রচুর মানুষ যুক্ত হতে লাগল। কারণ ইংরেজি শিখলে ভাল চাকরি পাওয়া যায়, ভাল প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। ভাল ল'ইয়ার হওয়া যায়। আর থিয়েটার মূলত মধ্যবিত্তের। এবং থিয়েটারে হিন্দু কোলাবোরেটারদের দু'ধরনের শাখা প্রথম থেকেই ছিল। একটা হচ্ছে কেরানিদের থিয়েটার আর একটা হচ্ছে মাস্টার ও অধ্যাপকদের থিয়েটার। অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন হোল টাইমার। গিরিশচন্দ্র ছিলেন চাকুরিজীবি। তিনি ফ্রাই-বার্জারে করণিকের চাকরি করতেন। শিশির ভাদুড়ি অধ্যাপক। কিন্তু তিনি ছিলেন বেহিসাবি অধ্যাপক। আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন ঠিক তার উলটো। তিনি পাই পয়সা, আনা কড়ির সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। তিনি ফ্রাই-বার্জারে বুক-কিপারের কাজ করতেন। টাকা পয়সার হিসেবটা খুব ভাল বুঝতেন। ফলে তিনি তাঁর থিয়েটারকে অনেক বেশি অর্থনৈতিকভাবে বা পেশাদারি অর্থে সফল করতে পেরেছিলেন। এবং আমাদের এখানে বরাবরই যা হয়েছে, করণিকদের থিয়েটারকে বন্দনা করা হয়েছে বেশি। সেভেন্টিজে এসে অতঃপর করণিক থিয়েটার চ্যাম্পিয়ন হল। মাস্টারমশাই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কোথাও পারলেন না, অধ্যাপক শিশির ভাদুড়ি কোথাও পারলেন না। করণিকরা এখানে ডমিনেন্ট হল। এবং করণিকরাই এখন ডমিনেট করছে। করণিক বা তাদের আত্মীয়-স্বজন বা তাদের ছেলেপুলেরা। বা তাদের ধরনের লোকেরা। ওদিকে শম্ভু মিত্র ছিলেন হোল-টাইমার। তিনি কোনোদিন কোথাও চাকরি করেননি। শম্ভু মিত্রের পিতা শরৎ কুমার মিত্র, খুব বড় চাকরি করতেন। উৎপল দত্তের পিতা পুলিশ ছিলেন। মানে নতুন হিন্দু কোলাবোরেটরদের আমলাতন্ত্রের সূত্রে পাওয়া বা সেই সব সুযোগ সুবিধায় অর্জিত চাকুরি। এই সবকিছুর তুল্যমূল্য বিচার যদি করি তা হলে আমি বলব যে গিরিশচন্দ্র ঘোষই হচ্ছেন এই ধারার একজন সফল উদ্‌গাতা। তিনি একইসঙ্গে করণিক এবং তিনি তাঁর ছেলেকে থিয়েটারের মত পেশায় প্রতিষ্ঠিত করাচ্ছেন। দানীবাবু হচ্ছেন বাংলা থিয়েটারে প্রথম লোক যিনি আসছেন তাঁর বাবার থিয়েটারের পেশায়। এবং গিরিশচন্দ্রই ডমিনেন্ট হয়েছেন বেশি অতএব তাঁকেই বেশি সফল বলতে হবে। অর্ধেন্দুশেখর সমাজে একজন ব্যতিক্রম। এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ি সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমি বুঝতে পারছি তিনি খানিকটা দিক্‌ভ্রান্ত। সমাজের কাছে শেষ অব্দি সহানুভূতি আশা করেছেন, এবং তা না পেয়ে সমাজের ওপর চটে গেছেন। মূলত সিনিক। গিরিশচন্দ্র কিন্তু তাঁর শেষদিন অব্দি সিনিক নন। তিনি

জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত মামলা লড়েছেন থিয়েটারের দখল নেওয়ার জন্য। তার মানে থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর অ্যাফেকশন আছে। সংলগ্নতার বোধ আছে। আর শিশির ভাদুড়ির মতো একটা লোক সিনিক হয়ে যাচ্ছেন। তার মানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ হচ্ছেন সফল। এই সম্পর্কে লাতিন আমেরিকার হর্হে লুই বোর্হেসের-এর (Jorge Luis Borges, Story Writer, Latin America) একটা গল্প বলব। লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটে। একটা কাল্পনিক উপজাতির রাজা কোনও একটা জায়গায় গিয়ে রাজ্য দখল করল। তারপর সেই দখলকৃত রাজ্যের রাজা ও সেনাপতি দুজনকেই বলা হল যে তাদের দুজনকেই প্রাণে মেরে ফেলা হবে। তখন ওই রাজা-সেনাপতি বলল যে, 'আমাদের দয়া করে প্রাণে মারবেন না। আমাদের প্রাণে বাঁচান'। তখন জয়ী রাজা বলল যে 'আমি তোমাদের প্রাণে বাঁচাতে পারি। আমি তোমাদের মাথা কেটে দিচ্ছি, তোমরা দৌড়োও। এবং যে তোমাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন পয়েন্টে হাত রাখতে পারবে, সে জিতবে'। তখন দু'জনের মাথা কেটে দেওয়া হল। তারা দু'জনই দৌড়তে শুরু করল। তারপর সেখানে দেখা গেল সেনাপতি হল সেই লোক যে চ্যাম্পিয়ন পয়েন্টের দড়িতে প্রথম হাত রাখতে পারল। বোরেজ লিখছেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সেই সেনাপতি নিজে জীবনের অন্তিমটুকু জেনে যেতে পারল না যে সে জিতেছে, অর্থাৎ সেই হয়েছে চ্যাম্পিয়ন। তো বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে বলা যেতে পারে, এই হল সাফল্য। আমাদের এখানে থিয়েটারে গিরিশ ঘোষ এবং শিশির ভাদুড়ির সাফল্য সম্পর্কে এই গল্পকে উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি।

দেবাশিস রায় : গিরিশ ঘোষ এবং শিশির ভাদুড়ি, এই দুজনের থিয়েটারের ক্ষেত্রে যে যাত্রা তা দুটো সময়কালের ঘটনা। গিরিশ ঘোষ মারা যাচ্ছেন ১৯১২ সালে। অর্থাৎ তাঁর নাট্যকর্মের সময়কালে রাজনৈতিকভাবে ঘটে গেছে অনেকগুলি অধ্যায়। যেমন ১৮৮৫ সালে পত্তন হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেসের। ১৯০৮ সালে ঘটে যাচ্ছে আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা। আর শিশির ভাদুড়ি যখন থিয়েটার করছেন তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠছে সারা দেশ। তখন গান্ধিজীর নেতৃত্বে চলছে প্রবল আন্দোলন। সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হয়েছে। তারাও বহু কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব কি এই দুজনের থিয়েটারের ওপর কোনও রেখাপাত করেছে?

ব্রাত্য বসু : শিশিরকুমারের সময়ে বাঙালি কমিউনিস্টরা ছিল, গিরিশচন্দ্রের সময়ে ছিল না। শিশিরকুমার একদিকে ছিলেন প্রবলভাবে নেহেরু বিরোধী এবং গান্ধী বিরোধী আবার অপরদিকে কমিউনিস্ট বিরোধীও বটে। শিশির ভাদুড়ি আসলে ছিলেন প্রো-সুভাষচন্দ্র বোস। তিনি গভীরভাবে বন্দনা করতেন নেতাজিকে। সে সব ইতিহাস আমার 'উদ্বাদিত মান্দাস'-এ আসবে। উনি মনে করতেন — ১৯৪৪ সালে সুভাষ বোসের চলে যাওয়াটা বাংলার এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিকে একেবারে অন্য খাতে নিয়ে গেছে। শিশির ভাদুড়ি মনে করতেন সুভাষ বোস বেঁচে থাকলে দেশভাগ হত না। আর কমিউনিস্টদের তো উনি পছন্দই করতেন না। যেহেতু এগুলো আমার উপন্যাসে পরবর্তী অধ্যায়ে আসবে তাই এগুলো নিয়ে বিশেষ কথা বলতে চাইছি না। শিশিরকুমার বাঙালিয়ানা বা

বাঙালি অস্মিতায় গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।

অরিন্দম ঘোষ : আমরা অবশ্যই অপেক্ষা করব। আমরা এখন 'উদ্বাসিত মান্দাস' পড়ছি। আমরা জানি শিশিরকুমার ভাদুড়ি আরও অনেক ব্যাপ্তি নিয়ে এই উপন্যাসে হাজির হবেন। আর আজ আমরা শুধুমাত্র আগের প্রকাশিত দুটি উপন্যাস নিয়েই আলোচনা করছি।

দেবাশিস রায় : আমরা আজকের এই আলাপচারিতায় আপনার কাছেই শুনলাম যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর অভিনয়শৈলীর সঙ্গে মিলিয়ে অমিত্রাক্ষর ভেঙে গৈরিশ ছন্দকে নিয়ে আসছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই আলাদা অভিনয়শৈলীর কথা মনে রেখে জানতে চাই শিশিরকুমারের অভিনয়শৈলী সম্পর্কে, যা ওই সময়কালের থিয়েটারের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছিল।

ব্রাত্য বসু : গিরিশচন্দ্র ঘোষের যে গৈরিশ ধারার অভিনয় তা কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়িও গোড়ার দিকে অনুসরণ করেছেন। তিনি কিন্তু অর্ধেন্দুশেখরের স্বভাববাদী অভিনয়ের ধারায় যাননি। শিশির ভাদুড়ির ধরণ ছিল অনেকটা লাউড, অনেকটা বড় — মানে দৈত্যাকার। আমার পড়ে পড়ে যা মনে হয়েছে তা হল এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রবীন্দ্র প্রভাব। রবীন্দ্র প্রভাব পড়েছে সেই অভিনয়ে। এই বিষয়টা আমি আমার উপন্যাসেও ধরার চেষ্টা করেছি। এই রবীন্দ্র প্রভাবের ফলে আমি বলব যে — টোয়েন্টিজ-এ শিশিরকুমার ভাদুড়ির কাজের ধারায় বা অভিনয়ে একক সত্তা তৈরি হল। অর্থাৎ মেনস্ট্রীম সোসাইটির সঙ্গে অনেক মধ্যবিত্ত মেলাতে পারল না নিজেকে, তারা বুঝতে পারল যে তারা যে পেশায় আছে, সেই পেশাটা আসলে খুবই অনিশ্চিত, তারা যদি শিক্ষক অধ্যাপক, উকিল বা আমলা হয়ে জীবন কাটাতে পারত তাহলে তাদের জীবন আরও অনেক ভাল কাটত। ফলে শিশিরকুমারের জীবনে এক ধরনের অ্যালিয়েনেশন তৈরি হল এই সমাজ থেকে। আর এই অ্যালিয়েনেশন মানেই সেখানে একটা একক নির্জন কণ্ঠস্বর এল। শিশির ভাদুড়ি হলেন নির্জন কণ্ঠস্বর বহন করা বাংলাদেশের প্রথম অভিনেতা। পরে শম্ভু মিত্রের মধ্যেও গভীরভাবে শিশিরকুমারের প্রভাব পড়েছিল। কারণ মনে রাখতে হবে যে আট মাস শম্ভু মিত্র শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে কাজ করেছেন। শিশির ভাদুড়ির অভিনয়ের সম্পর্কে আমি বলব যে তিনি হলেন লাউড, তিনি বৃহৎ এবং একই সঙ্গে তিনি এই নগরজীবন, ইনডাস্ট্রিলাইজেশন অর্থাৎ শিল্পায়ন, নতুন সমাজে বেকার তৈরি হওয়া, ইংরেজ শাসনের প্রতি যে অসন্তোষ, স্বাধীনতার আহ্বান, পাশাপাশি স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞতা এইসবের মধ্যে বেড়ে ওঠা একজন পরিপূর্ণ যুবা, যে যুবার নির্জ্ঞান মানে দ্য স্ট্রীম অফ কনসিয়াসনেস, যাকে জয়েস (Joyce), জোসেফ কনরাড (Joseph Conrad) বা ভার্জিনিয়া উলফ-রা (Virginia Woolf) তাঁদের লেখার মধ্যে নিয়ে এসেছেন ওই শিশিরকুমারেরই সময়কালের আশপাশের সময়ে ইংল্যাণ্ডে বা আয়ারল্যাণ্ডে। এখানে অভিনয়ের দিক থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁর কাজের মধ্যে এই ধারাকে প্রথম নিয়ে এলেন এবং এই কারণে ওঁকে আধুনিক বলে মনে হল। তাঁর সময়ের যে লেখক তাঁরা সবাই শিশির ভাদুড়ির অভিনয়ের ধারার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের লেখায় আনতে চেয়েছেন সেই ব্যক্তিমানুষের সংকটকে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু বা এই জাতীয় লেখকদের মনোভাবে রবীন্দ্রনাথকে যেমন

খুব ব্যাকডেটেড মনে হচ্ছে। 'কল্লোল' বা অন্যান্য পত্রিকার তর্কাতর্কি দেখলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এই আধুনিকতাকে শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রথম বাংলা মঞ্চে নিয়ে এলেন। এই হল শিশির ভাদুড়ির অভিনয়ের মূল বৈশিষ্ট্য। তবে তিনি নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটু ক্ল্যাসিকলপন্থী। তিনি আধুনিকযুগে সেই অর্থে কোন নাটককারের জন্ম দিতে পারেননি ঠিকই কিন্তু যোগেশ চৌধুরীকে নাটককার হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তারাকুমার মুখোপাধ্যায়কেও তিনিই পরিচয় করিয়েছেন। আমার মনে হয় একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে রাবীন্দ্রিক প্রভাব, একই সঙ্গে গিরিশ ঘোষের অভিব্যক্তিমুখ্য অভিনয়ের ধারা, এই দুটো ধারাকে মিশিয়ে তার সঙ্গে একক মানুষের যে বিচ্ছিন্নতার সংকট, নাগরিকত্বের যে অ্যাগনি (agony) সেটা প্রথম শিশির ভাদুড়ির অভিনয়ে ধরা পড়ল। এটাই আমার মনে হয় শিশির ভাদুড়ির অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য।

অরিন্দম ঘোষ : এবার লেখক ব্রাত্য বসুর কাছে চলে যাই। সাহিত্যে অথারস্ ফ্রীডম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ রাইটার যদি তাঁর কিছু মশলা না দেন তাহলে অবশ্যই সেটা চচ্চড়ি থেকে বিরিয়ানিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না। আপনি এত বিস্তৃত একটা প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রায় তিনটি উপন্যাস শেষ করতে চলেছেন এবং লেখা সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে। এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে আমরা ইতিহাসকে ভীষণভাবে পেয়েছি। এটা একদম চলমান ইতিহাস এবং একদম ক্রনোলজিক্যালি আসছে পরপর। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে — এই সবটার মধ্যে কল্পনার মিশ্রণ কতটা হয়েছে?

ব্রাত্য বসু : কল্পনা তো প্রবলভাবেই এসেছে। আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন, উপন্যাসটা ঠিক সব সময়ে বাস্তবে থাকে না। মাঝে মাঝে বাস্তব থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। 'অদামৃতকথা'-য় মৃত অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে যখন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে অমৃতলালের দেখা হচ্ছে, যখন খালের ধারে একটা ঘোড়ার ওপর গিয়ে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে তখন আসলে একটা অতীতকে নিয়ে আসা হচ্ছে।

অরিন্দম ঘোষ : বাস্তবতা এখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

ব্রাত্য বসু : অর্ধেন্দু তখন সেখানে প্রায় একজন রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো একজন নায়কের মতো আবির্ভূত হন। এবং সেখানে বলা হচ্ছে সে যেন ওপর থেকে প্রায় সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। এক অপরিসীম অভিমান এবং তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকিয়ে আছে। এই তাচ্ছিল্য এবং অভিমান এই দুটোই আসলে অভিনেতার মূল কথা। মানে ভাবখানা এমনই যে 'তোরা আমাকে বুঝিসনি। তোদের বোঝার কথাও ছিল না। তোরা আসলে বামন পিগমির দল !'

অমৃতলাল কোথায় যেন শুনতে পান যে তাঁরই কণ্ঠস্বর যেন তাঁরই কানে ভাঙা প্রতিধ্বনির মত শোনাচ্ছে। উপন্যাসের ওই অংশটি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আমার মনে হয় এই অংশে একটা কল্পনা আছে যা কোনও এক সময়ে বৃহত্তর অর্থে সাররিয়েলে চলে যায় বা এই উপন্যাসেই যখন কম বয়সের অমৃতলাল তার নারীসত্তাকে আয়নায় দেখতে পায়, সেখানেও কিন্তু কল্পনার একটা প্রভাব আছে।

অরিন্দম ঘোষ : বা শিশিরকুমার ভাদুড়ি আমেরিকা থেকে ফেরার সময় জাহাজে যখন হঠাৎ তাঁর

বাবাকে দেখতে পান তখন আপনার উপন্যাসে সাররিয়েলজিমের যে বিশিষ্ট প্রয়োগ, কিংবা রূপকের প্রয়োগ, সেখান থেকে মনে হয় অনেক কথাই বলা যায়। আমরা জানি, এ প্রয়োগ আপনি সাহিত্যের প্রয়োজনেই করেছেন যার কোন ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর ইতিহাস খোঁজার দরকারও নেই সেখানে। কারণ এটা সম্পূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার। এই যে আপনি অর্ধেন্দুর কথা বললেন, তা হল একজন অ্যাক্টরের ইগো। সেই অ্যাক্টর তাঁর নিজের অভিমানের জায়গা থেকে বলছে, চারপাশকে বোঝার মধ্যে দিয়ে বলছে — 'সত্যিই তোমরা আমাকে বোঝোই নি'। এটা খুব দামি কথা।

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ তার কারণ ইনিই প্রথম যিনি বাংলা থিয়েটারের ন্যাচারালিস্টিক অভিনয়কে নিয়ে এসেছেন। অথচ সেই অভিনয়কে কমিক অভিনয় বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাট হী ওয়াজ নট ওনলি আ কমেডিয়ান। অর্ধেন্দুশেখর যখন 'কৃষ্ণকুমারী'-তে ধনদাস করছেন, তা কিন্তু দুর্দান্ত অভিনয়। উনি যখন 'বলিদান'-এ গিরিশচন্দ্রের সাবস্টিটিউট হয়ে নামছেন, সেখানেও তিনি অন্যরকম অভিনয়ের স্বাক্ষর রাখছেন।

অরিন্দম ঘোষ : অনেকে বলেন সেই অভিনয় নাকি গিরিশচন্দ্রের অভিনয়কে ছাপিয়ে যেত?

ব্রাত্য বসু : কখনও কখনও তাঁর অভিনয় হয়ত খুব ভাল হত। কিন্তু 'বলিদান'-এ গিরিশ ঘোষ যখন করুণাময়-এর ভূমিকার অভিনয় করতেন তা ছিল শ্রেষ্ঠ। গিরিশকে অর্ধেন্দু সেখানে ছাপিয়ে যেতে পারেননি। প্রথমত, গিরিশ ঘোষ ইংরেজিটাও খুব ভাল জানতেন, তার সঙ্গে সাহিত্য বিষয়েও ধারণা ছিল স্পষ্ট। নিজে লিখতেও পারতেন। অভিনয় ভাল হওয়ার এগুলো এক একটা বড় কারণ।

দেবাশিস রায় : 'ম্যাকবেথ'-এর অনুবাদ তিনি করেছিলেন।

ব্রাত্য বসু : একই সঙ্গে আমি একটা কথা বলব আগের প্রসঙ্গকে উত্থাপন করে। এরা কিন্তু কেউই থিয়েটারকে পেশা করতে পারেননি। গিরিশচন্দ্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে থিয়েটারে হোলটাইমার হয়েছিলেন। অর্ধেন্দুশেখর প্রথম থেকেই হোলটাইমার। শিশির ভাদুড়িও চাকরি ছেড়ে হোলটাইমার হলেন। কিন্তু যাঁরা হোলটাইমার হলেন তাঁদের জীবনটা চরম অনিশ্চয়তার দিকে চলে গেল। কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে যে ইতিহাস তা আমি আমার পরবর্তী উপন্যাসে নিয়ে এসেছি। সেখানে আমরা দেখব যখন সিনেমা তার নিজ ক্ষেত্রে বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে উন্নতি করতে লাগল তখনও কিন্তু কিছু মানুষ চাকরি ছেড়ে সিনেমা জগতের হোলটাইমার হলেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানুষের জীবনটা কিন্তু অনেকটা নিশ্চয়তার দিকেই গেল। তাদের জীবন বর্ণময় এবং রঙিন হয়ে উঠল। অথচ থিয়েটারের ক্ষেত্রে তা হল না। ফলে এই উপন্যাসে যেটা বলতে চেয়েছি যে, থিয়েটারের পরিকাঠামোটা অপটু, অপেশাদার, ভাঙাচোরা। এবং এর জন্য যে শুধুমাত্র থিয়েটারের লোকেরা দায়ী এমনটা নয়। এসবের মধ্যেও অনেক অসামান্য নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস আছে। কিন্তু থিয়েটার দেখার চর্চা বাংলা ভাষার অন্য মাধ্যমগুলোর মতোই আমরা এখানে গড়ে তুলতে পারিনি। যেমন একটা তামিল সিনেমা নিয়মিত দেখাকে সেখানকার তামিল পরিবারেরা অত্যন্ত কম বয়স থেকে তাদের নিজস্ব রিচ্যুয়াল হিসেবে মনে করে এবং তারা সিনেমা নিয়মিত দেখে

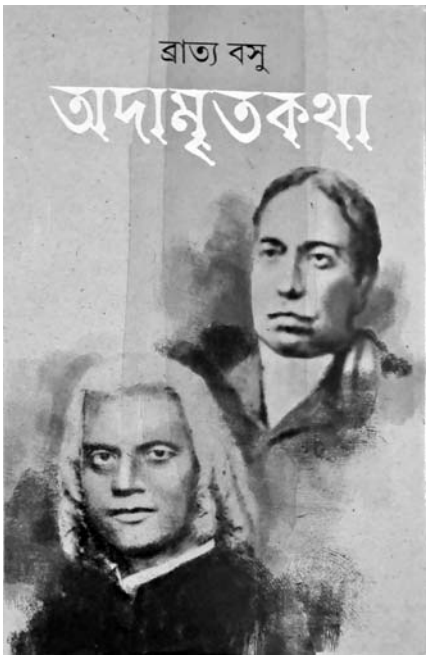

থাকে তাদের আর্থিক সঙ্গতি যাই হোক না কেন। কিন্তু আমাদের এখানে কোনও লোক মারাঠি বা গুজরাতি থিয়েটারের মতো তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে প্রতি হপ্তায় সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছেন এমনটা আমি কম দেখি। হ্যাঁ কিছু লোক আছেন যাঁরা পরিবার ছাড়া নিজেরা থিয়েটার দেখেন। অতএব রিচ্যুয়ালের মতো বাংলা সিনেমা দেখা বা থিয়েটার দেখা সেটা যেহেতু এখানে গড়ে ওঠেনি, ফলে অর্থনীতির দিক থেকে বরাবরই থিয়েটারকে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে বা ব্যক্তিগত স্পনসরশিপের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আর এই ধরনের প্রচেষ্টা কোনোদিনই খুব একটা সফল হয়নি। কারণ সেই স্পনসরশিপের পশ্চাতে কোনও না কোনও শর্ত থাকে যাকে অনুসরণ করে চলতে হয়।

অরিন্দম ঘোষ : যদিও এতবড় উপন্যাসের মধ্যে অনেক সিচ্যুয়েশন রয়েছে, তবু আমি মূলত দুটি অংশের কথা উল্লেখ করতে চাই যা আমাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। এক হল — 'অদামৃতকথা'-র সপ্তম পরিচ্ছেদে যেখানে অর্ধেন্দুশেখর একটি দীর্ঘ চিঠি লিখছেন। এটি একটি স্বগতোক্তির মত। এই অংশে তিনি তাঁর মনের সুখ-দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণা-অভিমানের কথা, তাঁর স্বপ্নের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। আরও একটা অংশ এসেছে — 'দ্যূতক্রীড়ক'-এ। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে দাহ করে ওঁর তিন বন্ধু শিশিরকুমারের ঘোষ লেনের বাড়িতে আসছেন। সৌরেন, মণিলাল আর হেমেন। এই অংশে শিশিরকুমার তার মনের অনেক গভীর কথা বলে যান এক দীর্ঘ সংলাপের মতো। তাও প্রায় স্বগতোক্তি। এই দুটি অংশ পড়তে পড়তে যেন মনে হয় যে ঔপন্যাসিক ব্রাত্য বসু ওই মুহূর্তে ওই চরিত্রের মুখ দিয়ে নিজের আত্মপ্রক্ষেপণ এবং আত্মউন্মীলন করেছেন এবং অনেক কথা বলেছেন।

ব্রাত্য বসু : হতে পারে। এমনটা দুটি উপন্যাসে আরও অনেক অংশে আছে। অর্ধেন্দুশেখরের চিঠিতে তো আছেই। 'উদ্বাসিত মান্দাস'-এও শিশিরকুমারের তেমনই একটি চিঠি আছে যার কথা আমি উল্লেখ করতে চাইছি না কারণ তা এখনও প্রকাশিত হয়নি। আর আমি যেহেতু বহু বছর ধরে থিয়েটারটা করেছি তাই আমার নিজের কথা তো কিছু আসতেই পারে।

অরিন্দম ঘোষ : নিশ্চয়ই। শুধু থিয়েটার বলব কেন, একজন শিল্পীর যা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিঘাত, তার উপলব্ধি, প্রতিটা ঘাত-প্রতিঘাত, সেগুলো কখনও কখনও মনে হয়েছে আপনারই কণ্ঠস্বর।

ব্রাত্য বসু : সে তো খুব স্বাভাবিক কথা। আমি থিয়েটার করেছি, থিয়েটার নিয়ে একটা অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। আর এই উপন্যাসগুলো যেহেতু থিয়েটারের মানুষদের নিয়েই লিখছি, ফলে স্বাভাবিকভাবেই তা, উঠে এসেছে। আর যাদের তা বোঝার তারা বুঝবে আর যারা বুঝবে না তারা এড়িয়ে যাবে। যাঁদের মনে হবে এ ঔপন্যাসিকের নিজস্ব কথা তাঁরা সেইভাবে পড়বেন, আর যাঁরা মনে করবেন এ শিশিরকুমারের কথা তাঁরা তাঁদের মতো করে পাঠ করবেন।

দেবাশিস রায় : আর এই বিষয়টাকেই যদি একবার নৈর্ব্যক্তিক দিক থেকে ভাবি, অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, এই উপন্যাস দুটি লিখতে গিয়ে আপনাকে তো প্রভূত পড়াশোনা করতে হয়েছে। থিয়েটারের ওই সময়টা, ওই যুগটা ওই সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা সবটুকুকে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে নতুন করে খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করতে হয়েছে। এই সামগ্রিক কাজটা আপনাকে কতটা পরিতৃপ্ত করেছে?

ব্রাত্য বসু : এই মানুষটা আমার মধ্যে ছিলই কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। আপনি বলতে পারেন উপন্যাসদুটি লেখার জন্য যে পড়াশোনা তার মধ্যে দিয়ে চরিত্রগুলো আরও কাছাকাছি এল। আমি এই উপন্যাস দুটোর মধ্যে দিয়ে সেইগুলোকে জুড়লাম।

দেবাশিস রায় : আমি খুব সাধারণভাবে যদি বলি, একটা পরম যুগ হচ্ছে গিরিশ যুগ আর একটা হচ্ছে শিশির যুগ। আমি এই যুগের কথা উল্লেখ করছি এই কারণে, যেহেতু আপনার উপন্যাসে ওই দু'জনই স্থান পেয়েছেন। একজন কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আর একজন পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাঁর উপস্থিতি এবং আপনি এই সময়ে কোম্পানি থিয়েটারের প্রবক্তা। একই সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটারের যে সংস্কৃতি তাও আপনি খুব গভীরভাবে দেখেছেন। কোম্পানি থিয়েটারে আপনার যে ভাবনা, গ্রুপ থিয়েটারের যে পর্যবেক্ষণ এবং বাংলার থিয়েটারের যে ইতিহাস — তাকে ঘিরে আপনার এই যে অতীতচারণা এসব কীভাবে এখানে সূত্রবদ্ধ হল?

ব্রাত্য বসু : এটা তিনটে উপন্যাস পড়লে বোঝা যাবে। এসব সম্পর্কে কথাবার্তাও আছে। গ্রুপ থিয়েটারও আসলে একটা কোম্পানি। কোম্পানি থিয়েটারের মূল কথাই তাই। মূলত পরিচালককেই সমস্তটা জোগাড় করতে হয়। তখন প্রযোজক আছে কিন্তু শিশির ভাদুড়ি কোন প্রযোজক পাচ্ছেন না। শিশির ভাদুড়ি ও তার সম্প্রদায়ও আসলে একটা গ্রুপ থিয়েটার। কোন প্রযোজক নেই। শিশির ভাদুড়িকে টাকার জোগাড় করতে হচ্ছে। মাছের তেলে মাছ ভাজছেন। এবং শিশিরকুমার শুধুমাত্র প্রযোজক নন, তিনি পরিচালকও বটে। বাইনারি অপোজিট। তাহলে কোম্পানি থিয়েটারের প্রথম শুরু হয়েছিল আমি বলব শিশির ভাদুড়িকে দিয়ে যা শুধুমাত্র পেশাদারি মঞ্চেই ঘটেছিল। পেশাদারি মঞ্চ থেকে এই প্রবণতার মধ্যে থেকেই গ্রুপ থিয়েটার তৈরি হয়েছে। এবং গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে কোম্পানি থিয়েটার ঢুকেছিল, সেখান থেকে পরবর্তী ক্ষেত্রে কোম্পানি থিয়েটারে পরিবর্তিত হয়েছে। এবং আমি আগেও বলেছিলাম যে থিয়েটার বেশিদিন বাঁচবে না। ক্রমশ সেইদিকেই যাচ্ছে। কিন্তু তবু থিয়েটার হবে। গ্যারাজে হবে, সমুদ্রের ধারে হবে, কোন স্কুলবাড়ির ভেতরে হবে। থিয়েটার বাঁচবে কিন্তু পেশাদার থিয়েটারের যে কাঠামোটা, এটা ক্রমশ নড়বড়ে ভঙ্গুর হয়ে ভেঙে পড়বে।

অরিন্দম ঘোষ : লেখককে আরও একটা প্রশ্ন। সেই একই জায়গায় যেখানে শিশিরকুমার বলছেন ‘যতোদিন বেঁচে থাকব, আমি চাই ওই মহৎ অনিশ্চয়তাগুলো যেন আজীবন আমাকে ধাওয়া করে বেড়ায়’ ক্রিকেটেও এই কথা প্রচলিত আছে। ‘করিডর অফ আনসার্টেনিটি’। অফস্ট্যাম্পের বাইরে যে অনিশ্চিত জায়গা... যত ভাল খেলবে উৎকর্ষ তত বাড়বে। তাই আপনাকে লেখক হিসেবেই প্রশ্নটা করছি, সেরকম কোনও অনিশ্চয়তা আপনাকে কোথাও ধাওয়া করে যা আপনার উৎকর্ষকে আরও বাড়াতে সাহায্য করে?

ব্রাত্য বসু : আমার মনে হয় অনিশ্চয়তার মধ্যে লেখকের লেখার উৎকর্ষ বাড়ে। একটা জীবনকে নানারকম টানাপোড়েনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলা, সেটা আমার মনে হয় একজন লেখকের খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু শুধুমাত্র অনিশ্চয়তা থাকলেই তো হবে না। আমি বলতে চাইছি যে সেই টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে এমন অনিশ্চয়তা তৈরি হল যার ফলে লেখক লেখাটিই লিখতে পারলেন না। আমি তেমন অনিশ্চয়তার কথা বলছি না। নিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তার একটা ভারসাম্য রক্ষা করে তাকে চলতে হবে। তা না হলে সে টিকতে পারবে না। কারণ অনিশ্চয়তাকে গ্লোরিফাই করে তো লাভ নেই। এখানে চোখের জলকে এত উদ্‌যাপন করা হয়েছে এবং সমৃদ্ধিকে এত সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে, ফলে এটা খুব গোলমেলে ব্যাপার। তাই অনিশ্চয়তাকে পাবলিকলি গ্লোরিফাই করতে অন্তত রাজি নই।

অরিন্দম ঘোষ : কিন্তু অনিশ্চয়তা দরকার। পারফেকশনের জন্যই দরকার।

দেবাশিস রায় : সর্বোপরি কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসা দরকার।

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ কমফর্ট জোন থেকে কোনও না কোনোভাবে বেরিয়ে আসাটাই প্রয়োজন।

অরিন্দম ঘোষ : গার্সিয়া মার্কেজ-এর (Gabriel Garcia Marquez) একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ওঁরই সাংবাদিক বাল্যবন্ধু। আপনি জানেন এই সাক্ষাৎকারটি নিয়ে ‘দ্য ফ্রাগরান্স অফ গুয়াভা’ নামে একটি বই প্রকাশিত হয় যা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় — ‘পেয়ারার গন্ধ’ নামে। এই সাক্ষাৎকারের শুরুতে তার বন্ধু প্লিনিও আপুলেয় মেনডোজা (Plinio Apuleya Mendoza) যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করেন ‘লেখা কি আনন্দের না যন্ত্রণার’?

ব্রাত্য বসু : লেখাটা লেখার সময়ে যন্ত্রণার। তারপর যে অনুভূতিটা হয় তা আনন্দের।

অরিন্দম ঘোষ : অনেকটা কি প্রসবযন্ত্রণার মত?

ব্রাত্য বসু : বলতে পারেন। আসলে আমি তো লেখা লিখি না। লেখা আমাকে লেখে। লেখা আমাকে ধাওয়া করে। যতক্ষণ না লেখাটা শেষ করতে পারছি ততক্ষণ একটা অস্থিরতার মধ্যে আমার কাটে। তা খানিকটা হয়ত প্রসবযন্ত্রণার মতোই। লেখার মধ্যে নানা পরিচিত বা অপরিচিত মানুষেরা আসে। তখন ওই লোকগুলোকে নির্মাণ করা যায়। তবে অপরিচিত হলেই ভাল। যেমন, ওই সাক্ষাৎকারেই গার্সিয়া মার্কেজকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় — ‘আপনার স্ত্রী কেন আপনার কোনও উপন্যাসে চরিত্র হয়ে উঠল

না'? তখন মার্কেজ বলছেন প্লিনিওকে — 'আমার স্ত্রী আমার এতটাই পরিচিত, তাকে আমি এতটাই জানি যে তাকে চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করতে পারিনি'।

আসলে এই অর্ধচেনা, অচেনা এবং লুকিয়ে থাকা লোকগুলোকে যখন আস্তে আস্তে স্পষ্ট করা যায় তখন বেশ আনন্দ হয়। তবে লেখার প্রসেসটা বেশ যন্ত্রণার কেননা বেশ খানিক অংশ আমি লিখলাম, লিখে আমার মনে হল, আরে! ওই সময়কালে তো ওই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা ঘটেছিল যা আজ আমার লেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত! যেমন 'উদ্বাসিত মান্দাস'-এ শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তীর প্রসঙ্গটা এসেছে। শিবরামের প্রসঙ্গ উত্থাপনের পরিকল্পনা আমার ছিল না। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে হল শিবরাম চক্রবর্তী, শিশিরকুমারের জীবনে এতটাই জড়িয়ে আছে যে শিবরামকে আনতেই হয়। ফলে সেই অধ্যায়টা আমাকে নতুন করে লিখতে হল। তাতে কিছুটা কষ্ট হল। এটা তো কবিতা নয় যে সংক্ষেপে বলে দিলাম। ছোট কথায় অস্ফুট ব্যঞ্জনাত্মক কিছু লিখে দিলাম। এ ক্ষেত্রে পুরোটাই একটা বিশদ, বিস্তারিত বর্ণনার দাবি করে।

অরিন্দম ঘোষ : বিশেষত যখন সে ঐতিহাসিকভাবে চরিত্র হয়ে আসে।

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ যখন চরিত্র হয়ে আসে। আমার দিক থেকে সেই চরিত্রকে সম্পূর্ণ করাটাই কাজ। কোন অসম্পূর্ণ ফাঁক থাকলে চলবে না। তাকে নতুন করে সাজিয়ে লিখতে হচ্ছে।

অরিন্দম ঘোষ : এরকম ক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা আমি জানতে চাইছি। মার্কেজ বলছেন যে, কখনও লিখতে লিখতে মনে হয়, মাঝদরিয়ায় আমি একা। এই লেখাটা আপনাকেই লিখতে হয়, যে কোন সাহিত্যিককে এই লড়াইটা একাই লড়তে হয়। এজন্য আপনার কি কখনও কোন একাকিত্বের অনুভূতি হয়? আমি অবশ্যই ব্যক্তিগত একাকিত্বের কথা বলছি না।

ব্রাত্য বসু : একাকিত্বের অনুভূতি বলতে লেখার মধ্যে ওই সব মুহূর্তগুলো বড় হয়ে ওঠে। আমার এই 'উদ্বাসিত মান্দাস'-এ আছে, লোকজনের সঙ্গ শিশিরকুমারের আর ভাল লাগছে না। বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। ঘরে ঢুকে পড়তে চাইছেন। আগে লোকজনের সঙ্গ ছাড়া তাঁর ভাল লাগত না। এখন মনে হচ্ছে একাকী খানিকটা সময় কাটাই। মধ্যরাতে রাজকৃষ্ণ রায় স্ট্রীট ধরে যে ফিটনগাড়ি ছুটে যাচ্ছে তার শব্দ, ঘোড়ার খুরের শব্দ বা মাতালরা যে মধ্যরাতে হল্লা করছে গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে, সেইসব হৈ-হল্লার টুকরো-টুকরো শব্দ কানের মধ্যে ভেসে আসছে। এই সব বিভিন্ন শব্দের মধ্যে দিয়ে একটা সাউণ্ডস্কেপ তৈরি হচ্ছে। নানারকম দৃশ্যকল্প তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অর্থাৎ তিনি ক্রমশ একটা অন্য জগতে চলে যেতে চাইছেন। বাস্তবকেও প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন। ওঁর মধ্যেও এক ধরনের অবসাদ জন্ম নিচ্ছে। এই অবসাদের খুব স্বাভাবিক ফলাফল হচ্ছে হিংস্রতা। ভায়োলেন্স তৈরি হয় অবসাদ থেকে। আর অনেকে সেই ভায়োলেন্সের সঙ্গে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করাতে পারে না। যারা কিছুটা স্থূল তারা এই ভায়োলেন্সের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে না পেরে তাকে পরিবারের ওপর টেনে নিয়ে আসে। আবার যারা সেনসিটিভ, তারা পরিবারের ওপর না হেনে নিজের প্রতি

প্রয়োগ করে ফেলে। তখন তা প্রায় আত্মহিংসার চেহারা নেয়। শিশিরকুমারের ক্ষেত্রে মাঝেমাঝে এমনটা খুবই হয়েছে।

অরিন্দম ঘোষ : আপনি আপনার জীবনের নানা ঘটনার অভিজ্ঞতাপ্রসূত বৃত্তান্ত নিয়ে লিখেছিলেন 'নটে গাছ' যা আমি বারবার পড়ে থাকি আমার ভাল লাগে বলে। ওই বইয়ে আপনি বলেছেন — 'কোন এক অসহায়তার জায়গা থেকে আমি অশালীন নাটক লিখতে শুরু করি'। এই অসহায়তার জায়গাটা তৈরি হওয়া এবং আপনি এইমাত্র যা বললেন তা হল, 'শিশির ভাদুড়ির তখন জনতার মাঝে নির্জনতাকেই ভাল লাগত'। তাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই দীর্ঘদিন যাবৎ লেখালিখির পরে আপনার কি আজও তেমনটাই মনে হয় বা আপনার কখনও লিখতে লিখতে, কনফ্রন্ট করতে করতে নিজেকে অসহায় মনে হয়?

ব্রাত্য বসু : (হেসে) না। আমি এই মুহূর্তে কোন মানসিক অসহায়তার জায়গায় বসে নেই।

অরিন্দম ঘোষ : না না, আমি আপনাকে তিন দশক আগের অবস্থানকে রেফার করলাম। তিরিশ বছর পর আপনি যখন একজন পরিণত, নিজের একটা ক্রিয়েটিভিটির জায়গা ধরে রেখেছেন, তখনও কি আপনার তেমনটাই মনে হয়? বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে একাধিক উপন্যাসের রচয়িতা আপনি।

ব্রাত্য বসু : লেখার জন্য আমার একটা উত্তেজনা কাজ করে ভেতরে ভেতরে। কখন আমি লিখতে বসব। কখন আমি খাতা-পেনের সম্মুখীন হব।

অরিন্দম ঘোষ : তার মানে অবশ্যই তা খুব আনন্দের। সে তো কোনও যন্ত্রণা নয়।

ব্রাত্য বসু : অবশ্যই আনন্দের। তখন আমি যেটা লিখতে চাইছি তা যেন আমি ছাপার অক্ষরে দেখতে পাচ্ছি। আমি হয়ত পুরোটা লিখতে পারলাম না যা আমি লিখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তবু অনেকটাই পারলাম।

অরিন্দম ঘোষ : এমনটা তো মনেই হয় একটা থিয়েটার করার পরে, কিংবা কোন শো দ্বিতীয়বার দেখার পরে, ফিল্মে নির্দেশনা বা অভিনয় করার পরে যে এই জায়গাটা এরকম না হয়ে ওরকম হলে ভাল হত।

ব্রাত্য বসু : যে কোন ক্রিয়েটিভ লোকেরই তেমনটাই মনে হওয়ার কথা।

অরিন্দম ঘোষ : অন্য ধরনের প্রশ্ন। আপনি কি হাতে লেখেন না কি টাইপ করেন?

ব্রাত্য বসু : বরাবরই হাতে লিখতাম আজও তাই।

অরিন্দম ঘোষ : প্রশ্ন করলাম এই কারণে যে, আপনি 'অশালীন' প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে আপনি লিখেছেন যে ওই নাটকের নাকি বাইশটা ড্রাফট হয়েছিল!

ব্রাত্য বসু : সে সময়ে। এখন হয় না। খুব বেশি হলে দুটো।

অরিন্দম ঘোষ : তার মানে অটো কম্পোজ হয়ে যায় মাথার মধ্যে। তারপর সেটা লেখার আকারে আসে?

ব্রাত্য বসু : এক আধটা অংশ হয়ত নতুন করে লিখতে হয়।

অরিন্দম ঘোষ : তার মানে ছেঁড়াছিঁড়ি, কাটাকাটি এখন খুব একটা হয় না?

ব্রাত্য বসু : না, খুবই কম। তবু রি-রাইট করি প্রায়শই। খুবই রি-রাইট করি।

দেবাশিস রায় : আপনার প্রথম উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। 'উদ্বাসিত মান্দাস'-ও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমার কৌতুহল হচ্ছে আপনি কি খণ্ড খণ্ড অধ্যায়ের আকারে কাগজে জমা দেন না কি সমস্ত অধ্যায়গুলো একসঙ্গে দেন?

ব্রাত্য বসু : 'অদামৃতকথা'-র পুরোটা একসঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলাম। 'উদ্বাসিত মান্দাস' তিনটি অধ্যায় একসঙ্গে দিয়েছিলাম।

তবে 'সংবাদ-প্রতিদিন'-এ যখন 'অদামৃতকথা' প্রকাশিত হয়েছিল তখন অধ্যায় ছিল সাতটা। কিন্তু যখন বই আকারে তা প্রকাশ পায় তখন অধ্যায়ের সংখ্যা হয় আট।

দেবাশিস রায় : ছয় নম্বর অধ্যায়টি পরে লিখলেন?

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ। আসলে লেখার পরে আমার মনে হয়েছিল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছাড়া আমার উপন্যাস অসম্পূর্ণ হবে। তাই অন্য একটি অধ্যায় পূর্ণাঙ্গভাবে আনা হল। যদিও উপন্যাসের শুরু থেকে গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতি ছিল কিন্তু পরে ওই গিরিশচন্দ্র ঘোষকে আলাদা অধ্যায়ে আনার মধ্যে দিয়ে তা সম্পূর্ণ হল।

দেবাশিস রায় : আমার প্রশ্নটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত স্তরের। 'অদামৃতকথা' উপন্যাসটি আপনি একসঙ্গে প্রকাশকের দপ্তরে জমা দিলেন। আমার জানার বিষয় এই যে উপন্যাসটির লেখা এবং প্রকাশিত হওয়ার এই যে সন্ধিক্ষণ, সেই সময়ে আপনার মধ্যে কি প্রবল মানসিক চাপ ছিল? যেহেতু এটি আপনার জীবনের প্রথম উপন্যাস সেহেতু এই প্রশ্নটা আপনাকে করছি।

ব্রাত্য বসু : মানসিক চাপ মানে একটা সংশয় ছিল পাঠকদের উপন্যাসটি পড়ে ভাল লাগবে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, পাঠকের ভাল লাগলেই বা কি, না লাগলেই বা কি। আমি তো আমার তাগিদেই লিখেছি। ভাল লাগলে ঠিক আছে, ভাল না লাগলে কিছু করার নেই। সেসময়ে আমি অর্ধেন্দুশেখরকে নিয়ে একটু-আধটু পড়ছিলাম।

তারপরে অবশ্য ওই পত্রিকা থেকে আমাকে অমৃতলাল বসুকে নিয়ে একটা লেখা লিখতে বলা হয়। আমি তখন অমৃতলালকে নিয়ে নতুন করে পড়াশোনা শুরু করি। পড়াশোনা করতে গিয়ে অর্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে আরও বিশদে আমি জানতে পারি। তখন আমি প্রকাশককে জানালাম যে, আমি একটা উপন্যাস লিখতে চাই অধেন্দুশেখরকে এবং অমৃতলালকে নিয়ে।

অরিন্দম ঘোষ : অমৃতলালকে নিয়ে যে লেখার অনুরোধ এসেছিল তা কি উপন্যাসের জন্যই ছিল?

ব্রাত্য বসু : অমৃতলালকে নিয়ে যে লেখার অনুরোধ এসেছিল তা ছিল প্রবন্ধের। তবে আলাদা করে একটা উপন্যাস লেখার অনুরোধও ছিল। আমি পরে ওঁদের দুজনকে কেন্দ্র করে একটা উপন্যাস লেখার সিদ্ধান্ত নিই। প্রবন্ধ নয়।

অরিন্দম ঘোষ : তার মানে নিজের তাগিদ এবং ফরমায়েশ এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটল।

ব্রাত্য বসু : খানিকটা তাই।

দেবাশিস রায় : যদিও আমরা এই আলোচনায় আনলাম না কিন্তু আপনার এই ধরনের সাহিত্যের কাজ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি — 'বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল' নামক গ্রন্থ যেখানে আপনি পৃথিবীর বিশিষ্ট কবিদের জীবন ও সাহিত্যনির্মাণ প্রসঙ্গে লিখেছেন। এই গ্রন্থে আপনি প্রচুর বিদেশি কবিতার অনুবাদও করেছেন। আজকের আলাপচারিতার প্রথমেই আমরা আপনার কবিতার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। ২০১৭-১৮ সাল নাগাদ আপনার কবিতা একবার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেরকমই সম্পূর্ণ একটা গ্রন্থে কবিতার অনুবাদ এবং সেইসব বিশিষ্ট কবিদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ এই রচনা 'বেরিন তরঙ্গে...' প্রকাশিত হয়েছে। কখনও কবিতা, কখনও নাটক, কখনও প্রবন্ধ, কখনও গল্প, এখন উপন্যাস। এতটা বহুমুখী লেখালিখিতে আপনি কিভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন?

অরিন্দম ঘোষ : অর্থাৎ আমরা বুঝতে চাইছি লেখা আপনার কাছে কী? আবেগ, শিল্প না সত্যকথনের একটা বিপ্লব?

ব্রাত্য বসু : এটা বলা মুশকিল। আসলে লেখা এত কম বয়স থেকে আমার জীবনের সঙ্গে মিশে আছে যে আমি তাকে পৃথক করে ভাবি না।

অরিন্দম ঘোষ : আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে? দীর্ঘদিন লেখার পরে?

ব্রাত্য বসু : একটা লেখা হল একটা কনফেশন বক্স। লেখাকে মূলত সত্য কথা বলতে চাওয়ার একটা কনফেশন বক্স বলা যায়।

অরিন্দম ঘোষ : লেখার সময়ে আপনি কি আপনার ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে সচেতন থাকেন? যা চিন্তা চেতনায় আসে তাই উজাড় করে দেন? মানে ইমপ্রম্পটু চলে আসে?

ব্রাত্য বসু : যা ভাবনায় আসে তাকে নির্মাণ করতে হয়। আমি কোন গদ্যে সেটা লিখব তা সেই মুহূর্তে ভাবতে হয়। লিখতে লিখতে আমি শব্দ পাল্টাই। তাতে লেখাটা অনেক বেশি কমিউনিকেটিভ হয়। শিশির ভাদুড়িকে নিয়ে একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস, এমনটা শুনলে অনেক পাঠক আগ্রহহীন হতে পারেন। সেই জন্য আমি চেষ্টা করি যাতে লেখার ধরনটা আকর্ষণীয় হয়। তেমনটাই আমি বজায় রাখার চেষ্টা করি।

অরিন্দম ঘোষ : তার মানে ক্রিয়েটিভ ডেলিভারির সঙ্গে একটা কনশিয়াস এফর্ট থাকে।

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ, সেখানে আরও বেশি এফর্ট থাকে কেননা সেখানে নগদ বিদায়ের ব্যাপার থাকে। বিগত প্রায় তিরিশ বছরে আমি যে যে নাট্যনির্মাণ করেছি তা দর্শকমহলে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ফলে বুঝতেই পারছেন সেখানে আমাকে সংলাপের কথা ভাবতেই হয়েছে। 'রুদ্ধসংগীত', 'উইঙ্কল টুইঙ্কল', 'অদ্য শেষ রজনী', 'মুম্বাই নাইটস', এই সব প্রযোজনাগুলো যে পরিমাণ দর্শক দেখেছে তা এই শতাব্দীর একটি উদাহরণ তো বটেই।

অরিন্দম ঘোষ : আপনার দু'টি উপন্যাসের মধ্যে এবং আরেকটি উপন্যাস 'উদ্বাসিত মান্দাস' যা বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে — এগুলির মধ্যে মূলত উত্তর কলকাতা প্রবলভাবে উঠে এসেছে।

ব্রাত্য বসু : 'উদ্বাসিত মান্দাস'-এর পরবর্তী অধ্যায়ে দক্ষিণ কলকাতা আসবে।

অরিন্দম ঘোষ : এই উপন্যাসগুলিতে এক একটা জায়গা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যে, আপনি আপনার শৈশবে এবং কৈশোরে যেমন কলকাতাকে দেখেছিলেন বা গন্ধটা পেয়েছিলেন তারই অনেকটা প্রতিফলন ঘটেছে এবং তা আপনি খুঁজেও বেরিয়েছেন যা আপনার রচনার মধ্যে এসেছে। আজ জীবনের এই সময়ে পৌঁছে কলকাতার প্রতি একটা ভালবাসা আপনার লেখার মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার তাই মনে হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার আজও কি কলকাতাকে সত্যি ভাল লাগে, যে আন্দাজ আপনার লেখা থেকে আমরা পাচ্ছি?

দেবাশিস রায় : আমি এই প্রশ্নটিকেই অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে করছি। যেহেতু উত্তর কলকাতাতেই আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সেহেতু 'দ্যূতক্রীড়ক'-এ উত্তর কলকাতার যুগীপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলগুলো সম্পর্কে আমি জানি। কিন্তু উনি তো মূলত পূর্ব কলকাতায় বেড়ে উঠেছেন।

ব্রাত্য বসু : এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তীর একটা দারুণ গল্প আছে। পুরীতে একটি হোটেলে দুটি লোকের দেখা হয়েছে। একজন অপরজনকে বলছেন — 'কোথায় থাকেন?' তখন দ্বিতীয়জন বলছেন — 'কলকাতায় থাকি'। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলেন — 'কলকাতার কোথায় থাকেন? দক্ষিণ না উত্তর?' দ্বিতীয়জন উত্তর করলেন — 'উত্তরে'। প্রথমজন আবার প্রশ্ন করলেন — 'উত্তরের কোথায়? মানিকতলার দিকে?' দ্বিতীয়জন বললেন — 'না আর একটু দূরে'। প্রথমজনের আবার প্রশ্ন — 'হাতিবাগানের দিকে? শ্যামবাজার?' দ্বিতীয়জন বললেন — 'না'। প্রথমজন আবার জিজ্ঞেস করলেন — 'তাহলে কোথায়?' দ্বিতীয়জন বললেন — 'ব্যারাকপুর'। এবার দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে জিজ্ঞাসা করলেন — 'আপনি? আপনি কোথায় থাকেন?' প্রথমজন উত্তর করলেন — 'আমি থাকি কলকাতা থেকে একটু দূরে। বাইরে থাকি'। দ্বিতীয়জন বললেন — 'দূরে কোথায়'? প্রথমজন বললেন — 'ভবানীপুর'। সুধীর চক্রবর্তীর এই লেখাটার অর্থ হচ্ছে যে, (হাসতে হাসতে) শুধুমাত্র পূর্ব কলকাতা নয়, আমি দক্ষিণ দমদম পুরসভা চত্বরে বড় হয়েছি। এখানেই আমার জীবন কেটেছে। আর আপনারা দুজনেই টালার জল খেয়ে বড় হয়েছেন।

অরিন্দম ঘোষ : কিন্তু কৈশোর ও যৌবনের একটা বড় সময় আপনার কলকাতাতেই কেটেছে। এবং সেখানে আপনিও কর্পোরেশনের জল খেয়ে বড় হয়েছেন।

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ কলকাতার অসংখ্য অলিগলিতে আমার যাতায়াত ছিল। কলেজ জীবনে আমি ওই সব অঞ্চলে অনেক ঘুরেছি। নিমতলা থেকে শুরু করে আহিরীটোলা প্রায় সর্বত্র। আমার ভাল লাগত।

অরিন্দম ঘোষ : এখনও কলকাতা আপনার ভাল লাগে?

ব্রাত্য বসু : এখনও লাগে। আমি মাঝেমাঝেই যখন গাড়ি নিয়ে ফিরি, তখন সাধারণত গাড়িগুলো পোদ্দার কোর্ট থেকে গিয়ে ডালহৌসির দিকে বেঁকে যাওয়ার কথা। ডালহৌসি মানে বলতে চাইছি সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন। আমি কিন্তু ফেরার সময় মাঝেমাঝেই চিৎপুরের রাস্তাটা ধরি। সেই রাস্তা ধরে আবার বাঁ দিকে যাই। তারপর আবার গঙ্গার ধারে যাই। আবার ঘুরি তারপর নিজের পথে ফিরি।

অরিন্দম ঘোষ : সত্যি এটা খুবই ইন্টারেস্টিং।

আমি আর একটা জায়গা ছুঁতে চাই। একটি সেনসিটিভ জায়গা। এই অংশে কতটা কল্পনা কতটা সত্যি কতটা ইতিহাস আমি জানি না। তবু আপনার কাছ থেকে শুনে নিশ্চিত হতে চাইব।

যে কথাটা দেবাশিসদা বলেছিলেন যে, অর্ধেন্দুশেখর এবং অমৃতলালের মধ্যে আপনি যে সমকামের ইঙ্গিত রেখেছেন। শেষের সাররিয়াল দৃশ্যে ভুনি এসে অমৃতলালকে বলছে — 'অর্ধনারীশ্বর'। উল্লেখ করে অমৃতমদিরা কাব্যের কথা, সেটা কি সত্যতার সূত্র ধরে এসেছে, নাকি এটা লেখকের কল্পনায় আরোপিত এক মাত্রা?

ব্রাত্য বসু : চৈতন্যের ক্ষেত্রে যে কথাটা বলা হয়, মাইকেলের ক্ষেত্রে যে কথাটা বলা হয়, গৌরদাস বসাকের-এর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে, আরেকটা লেখায় একটা সূত্র পেলাম সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বা শিবরাম সম্পর্কে।

আসলে এই সব সম্পর্ক নিয়ে নিশ্চিতভাবে তো কিছু বলা যায় না। তাই আমি আমার উপন্যাসে অমৃতলাল-অর্ধেন্দুশেখরের সম্পর্ক নিয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু উল্লেখ করিনি। সামান্য ইঙ্গিত করেছি মাত্র।

অরিন্দম ঘোষ : হ্যাঁ ইঙ্গিতই রয়েছে।

ব্রাত্য বসু : আমার যেটা মনে হয় যেহেতু অমৃতলালের মধ্যে একটা নারীসত্তা ছিল, ওঁর কথা বলার মধ্যে এক ধরনের কমনীয়তা ছিল, অবশ্য তা থাকলেই বা কি ক্ষতি, না থাকলেই বা কি। কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমার মনে হল যে, ওঁর অর্ধেন্দুর প্রতি যে মুগ্ধতা, যে উচ্ছ্বাস তাতে অন্তত একটা প্রেমের দৃষ্টি আছেই। সেটা মনে হয়েছে।

অরিন্দম ঘোষ : একটা আকর্ষণ কোথাও যেন ছিল। দুই শিল্পীপুরুষের একটা যৌন আকর্ষণ।

ব্রাত্য বসু : যেহেতু উইমেন এক্সপোজার বিষয়ে বলতে গিয়ে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখছি, সেহেতু উল্লেখ করা হয়েছে তিনি তাঁর বাড়িতে বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন। সেটা অনেক পরে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরিতে বউয়ের সঙ্গে আলাপ করানোটা প্রায় গর্হিত কাজ ছিল। ফলে সেই সময় পুরুষেরা বেশির ভাগই বাড়ির মহিলা ছাড়া অন্য কোন মহিলার মুখ দেখেননি।

অরিন্দম ঘোষ : আমরা বরাবর যেটা দেখেছি যে, বাংলায় প্রতিষ্ঠিত যত লেখক-সাহিত্যিকের লেখা কোনও না কোনও সময়ে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তার পরে উপন্যাস

আকারে প্রকাশ পেয়েছে। আপনার ক্ষেত্রেও তাই। প্রথমে সেটা কোন একটা সাময়িক পত্রিকায় বেরোল। আমরা সবাই ধারাবাহিকভাবে পড়লাম। এবং পরবর্তী সময়ে বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। আপনি যেমন প্রথম উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনুরোধ পেয়েছিলেন তেমনি আপনি যখন 'দ্যূতক্রীড়ক' লিখতে গেলেন তখন সরাসরি বই লিখতে গেলেন না কেন? ঔপন্যাসিক ব্র্যাণ্ড হিসেবে আপনি কিন্তু তখন এসট্যাব্‌লিশড্।

ব্রাত্য বসু : তখন আরেকটা কাগজ শারদীয় উপন্যাসের জন্য অনুরোধ করল। আমার তৈরি ছিল আমি দিয়ে দিলাম। তারপর বই আকারে প্রকাশ পেল।

অরিন্দম ঘোষ : তার মানে শুধুমাত্র ওই সময়ের কারণে। এই প্রসঙ্গে অন্য প্রশ্ন এই যে —
আমরা প্রায়ই একটা কথা বলতে শুনি যে বাঙালিদের সাহিত্য পড়ার অভ্যাস বদলে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়? বিশেষত এই দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর আপনি যে ধরনের প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন।

ব্রাত্য বসু : উপন্যাস দুটি নিয়ে আমি যা প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তা বেশ ভালই। বেশ কিছু লোকের ভাল লেগেছে।

অরিন্দম ঘোষ : অভ্যাস কি বদলে যাচ্ছে বাঙালির?

ব্রাত্য বসু : আমার ধারণা, পড়ার অভ্যাসটা বাঙালির বরাবরই কম। বিশ্বায়নের পর সেই অভ্যাস আরও কমে গেছে। বেশির ভাগই এখন ফেসবুক, ইন্টারনেট, ব্লগ এসব নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এসবের মধ্যে আমরা যারা লেখালিখির চর্চা নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছি, তারা এখানে মাইনরিটি। এই সংখ্যালঘু অংশকে বাদ দিয়ে অধিকাংশ মানুষ পড়ল কি পড়ল না, আমরা অধিকার পেলাম কি পেলাম না তা না ভাবলেও চলবে। বেঁচে আছি, টিকে আছি, আমাদের এই সমাজে থাকতে দেওয়া হচ্ছে এই অনেক। এটাই মনে হয় যথেষ্ট।

দেবাশিস রায় : আপনার লেখক সত্তার বাইরে গিয়ে যদি দেখেন, আগেকার কথাসাহিত্যের সঙ্গে আজকের কথাসাহিত্যের মোটের ওপর যদি একটু তুলনা করা যায় তাহলে সেটার ব্যাখ্যা কী হতে পারে?

ব্রাত্য বসু : আমার মনে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময় আখ্যান যে রকম প্লট আকারে ছিল তার অনেকটাই রবীন্দ্রনাথ বিপর্যস্ত করলেন। আমার নিজের ধারণা রবীন্দ্রনাথের প্লট গঠনের ক্ষেত্রে নিজস্ব একটা সমস্যা ছিল। এই কথা বিভুতিভূষণের ক্ষেত্রেও হয়ত খানিকটা প্রযোজ্য। কিন্তু বিভুতিভূষণ এমন এমন সব ছোটগল্প লিখেছেন বা উপন্যাস লিখেছেন তা এক একটা মুহূর্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এক একটা মুহূর্তই এক একটা ছোট গল্প।

হৃদয়ের একটা অনুভূতি। 'এই মুহূর্তের', 'আজকের দিনটা' এসব এক একটা অনুভূতি। বিভূতিভূষণের ভাষায় — 'আজকের দিনটি বেশ কাটিল'। এই যে 'বেশ কাটিল', এইটা নিয়ে একটা গল্প। আর আমরা বিভূতিভূষণের প্লট ভেঙে দেওয়া প্রসঙ্গে বলতে পারি, তাঁর গল্পে বা উপন্যাসে হয়ত একটা চরিত্র এল। সেই চরিত্র পঞ্চাশ পাতা বা একশো পাতা জুড়ে রইল। তার পরের একশো পাতায় সেই চরিত্রের কোন স্থান রইল না।

কিন্তু তার পরে আবার সেই চরিত্র খুব স্বাভাবিকভাবে ফিরল। আবার পাতার পর পাতা তাকে নিয়ে চলল। এই যে আখ্যানের ক্ষেত্রে একটা প্লট যুক্ত হওয়া এবং আবার প্লটহীনতা, এটা বিভুতিভূষণের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। তারাশংকরের গল্পে যেমন প্লট খুব জাঁদরেল ব্যাপার। প্লট সেখানে কুলিশ, কঠোর। স্ট্রাকচারড হয়ে আছে। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিষয়টিই চ্যাম্পিয়ন হল। কিন্তু আমি মনে করি, একটা গল্প পাঠককে পড়াতে গেলে গল্পরস থাকাটা খুব জরুরি। এবং তার সঙ্গে খুব ঠাস বুনোট গদ্য হওয়া দরকার।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বা মতি নন্দী আমার খুব প্রিয় লেখক। মতি নন্দীর লেখায় তবু প্লট আছে। কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রায়ই প্লট থেকে বেরিয়ে যান। সেখানে মনোজগতের নানারকম কারবার সমানে ঘটতে থাকে। ওই চরিত্রকে নিয়ে। এমনটা ঘটতে ঘটতে কোনও কোনও লেখকদের মেগালোম্যানিয়াও হয়ে যায়। নিজেকে নিয়েই বলে চলেছেন। সেখানে সম্বিত ফিরে পাওয়াটা দরকার। এই সম্বিতটা বড় লেখকদের লেখায় খুব আছে। এবং ওই সম্বিতটা যদি এখনকার লেখায় থাকে তাহলে সেই লেখা পাঠকদের পড়তে উৎসাহিত করতে পারে। তাই এখনকার লেখক বা আগের সময়কালের লেখক এমন করে ভাগাভাগি আমি করতে পারি না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প-উপন্যাস অত্যন্ত স্ট্রাকচারড। এমনকি 'ঘনাদা' পর্যন্ত। এর কতটা ভ্রমণকাহিনী, কতটা সাহিত্য তা মাঝে মাঝে বোঝা যায় না। কিন্তু খুব ওয়েল স্ট্রাকচারড। এই স্ট্রাকচার ব্যাপারটা আমার মনে হয়, একটা লেখার ক্ষেত্রে খুব জরুরি।

অরিন্দম ঘোষ : লেখকের প্রসঙ্গ যখন এল তখন সেই প্রসঙ্গে একটা ছোট প্রশ্ন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে যদি একজনকে বাছতে বলা হয় তাহলে আপনার সবচেয়ে প্রিয় লেখক কে?

ব্রাত্য বসু : বাংলা সাহিত্যে যদি এক থেকে দশ ক্রমান্বয়ে সাজাতে বলেন তাহলে আমি বলব — এক : বিভুতিভূষণ, দুই : বিভুতিভূষণ, তিন : বিভুতিভূষণ, চার : বিভুতিভূষণ, পাঁচ : বিভুতিভূষণ ... দশ অব্দি বিভুতিভূষণ। এগারো থেকে ভাবব।

অরিন্দম ঘোষ : বাঃ!

দেবাশিস রায় : কোথাও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নেই?

ব্রাত্য বসু : এগারো থেকে কুড়ির মধ্যে নিশ্চয়ই থাকবেন।

দেবাশিস রায় : আপনি গল্পরসের কথাটা এখানে বললেন, কিন্তু ষাট-সত্তর দশকের বেশ কিছু গল্পকাররা ঠিক তার উল্টো কথাটা বলছেন তখন। এই যে বাসুদেব দাশগুপ্ত, অসীম রায়, এদের কথা বলছি। তাঁরা বলছেন — গল্পে যেন কোনও গল্প না থাকে ।

ব্রাত্য বসু : সন্দীপনও তেমনটাই চেয়েছেন। সন্দীপন তো এই সূত্রেই বিভূতিভূষণকে আলাদা করেছেন। বলেছেন — 'সেখানে ইণ্ডিভিজুয়াল প্লট তেমন কিছু নেই'। সন্দীপন ওটা ধাক্কা দেওয়ার জন্যই করেছেন। আমি জানি না তবে বাসুদেব নিশ্চয়ই অনেকে পড়েছেন। অসীম রায়, সন্দীপনও নিশ্চয়ই অনেকে পড়েছেন। এছাড়া জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প লিখে গেছেন। এদের ধারণা আমি বলব, খানিকটা জগদীশ গুপ্ত থেকে আসছে। জগদীশ গুপ্ত তখন বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণভাবে একটা নতুন ব্যাপার নিয়ে এসেছিলেন। তার মধ্যে যেমন ফেটালিজম বা নিয়তিবাদ আছে তেমনি আবার তার সঙ্গে একটা অদ্ভুত স্ট্রাকচারড প্লট আছে, আছে ভীষণ নিষ্ঠুরতা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখাতেও আমরা সেটা পাব। আমি শৈলেশ্বর ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্তের লেখা পড়েছি। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ধারাটায় খানিকটা লিখেছিলেন মানব চক্রবর্তী। কিন্তু রবিশংকর বল পরে যে ধারায় গেলেন মানে মহাকাব্যিক নির্ভর বিস্তার যার মধ্যে অনেক রকম চরিত্র আসে, অনেক রকম চরিত্র বেরিয়ে যায়। ইতিহাস ঢোকে ইতিহাস বেরিয়ে যায়। এই ধরনের উপন্যাস বরাবরই আমাকে আকর্ষণ করেছে। এই ধরনের অত্যন্ত আত্মগত উপন্যাস আমার পছন্দের। যেমন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমার খুব প্রিয় লেখক। আমার মনে পড়ে, তাঁর লেখা 'শাহাজাদা দারাশুকো' যা আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে, তাতে ইতিহাসের ওই বর্ণাঢ্য স্বপ্নিল নানারকম বিস্তার আছে। বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়'-ও হয়ত আমার কাছে সেই আওতায় পড়ে। কিন্তু তার থেকে আমার খুব প্রিয় লেখা হচ্ছে- 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বা 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমি বলব 'ঈশ্বরীতলার রূপকথা', 'হাওয়া গাড়ি', যেখানে ব্যক্তিমানুষের সংকট, আধুনিকতার প্রকাশ আছে। ইতিহাস সেখানে কম। অতএব, ওইটা ওইভাবে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে এই লেখাটাই ভাল। আমার প্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ এটুকু বলতে পারি।

এই যে ক্লদ সিমোঁ (Claude Simon), ফরাসি ঔপন্যাসিক, তাঁর লেখা আমি পড়ে দেখেছি বা হারুকি মুরাকামি (Haruki Murakami), জাপানি লেখকের লেখায় কতটা ইতিহাস, কতটা আখ্যান, কতটা কল্পনা এগুলোকে মিশিয়ে দেওয়া হয়। কখনও প্লট চলছে কখনও প্লটকে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। পড়তে গিয়ে কখনও মনে হয়েছে গোয়েন্দা উপন্যাস কখনও জাতির মগ্নচৈতন্যের ইতিহাস, আবার পরে মনে হচ্ছে ওটা ব্যক্তিমানুষের স্বগতোক্তি। ক্লদ সিমোঁ-র লেখাতেও সেই বৈশিষ্ট্য আছে।

আমার তো মনে হয় যে এখন যে সময় তাতে কোন নির্দিষ্ট ফর্ম অবলম্বন না করাই

ভাল। নানা কিছুকে মিশিয়ে দেওয়াই ভাল। আমি বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' উপন্যাসের কথা বলতে চাই। এটি একটি ক্লাসিক উপন্যাস। আমার ধারণা ওটা বাংলায় তো খুবই সমাদৃত। বিদেশেও খুব সমাদৃত হওয়ার মত। আমার অভিজ্ঞতায় এমন উপন্যাস খুব কম লেখা হয়েছে। 'ইছামতী'-তে আমরা দেখব যে, সেখানে নীলকুঠির বিষয় ঢুকেছে, দাদনের প্রশ্ন ঢুকছে, রায়তের সঙ্গে মধ্যসত্ত্বভোগীর মারামারি চলছে নীলকুঠির বখরা নিয়ে। নতুন উপসত্ত্বভোগী উঠে আসছেন রাজারামদের মতো যারা জমিকে কেন্দ্র করে বা নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়াতে চায় সাহেবদের নৌকর হয়ে। আবার আমিন প্রসন্ন চক্রবর্তীর মত লোকও সেখানে আসছে। প্রসন্ন আমিন যে নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে বাঁচে এবং বড় সাহেবের রক্ষিতার প্রতি সে মনে মনে আকর্ষণ অনুভব করে। মনে মনে গয়া মেমকে সে পেতে চায়। আবার একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে ভবানীর মত লোক আসে। তিনি খানিকটা আধ্যাত্মিক, খানিকটা ঔপনিষদিক। আবার তার তিন বউ। বিলু-নিলু-টিলুকে নিয়ে সে বলে, তাদের নিয়ে স্নান করতে যায়। তাদের নিয়ে সে বেরোয় পাড়ায়। এই একই সঙ্গে পাড়া-গাঁ-র ছবি আসছে, একই সঙ্গে একটা ইতিহাস ঢুকছে, আমার ওই উপন্যাস পড়তে গেলে মনে হয় আমরা প্রায় যেন দুশো বছর আগে আমরা ফিরে গেছি। ফিরে গেছি দেড়শো বছর আগে সেই সিপাহী বিদ্রোহের আগের সময়ে। অথচ সেটা একটা স্থানিক ভূগোলকে লোকেট করে দিচ্ছে। আবার একই সঙ্গে যেন স্থানিক থাকছে না। আমার তো ইন ফ্যাক্ট ভবানীকে সত্যচরণের থেকেও বড় দার্শনিক মনে হয়। সত্যচরণ মানে 'আরণ্যক'-এর যে মূল চরিত্র। যার আসলে কোন কষ্ট নেই এ সমাজে যার কোন বেদনা নেই। তার দৈনন্দিন কিছু সমস্যা আছে কিন্তু যে বিপন্নতা, সার্বিক যে বিপন্নতা, তাকে সে অতিক্রম করে গেছে। 'ইছামতী'-তে ভবানী যখন তার পুত্রের সঙ্গে, তার খোকার সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, তখন সেই সব অপার্থিব মুহূর্তকে উপন্যাসে নিয়ে আসা হয়েছে। ওইগুলো আনা মুশকিল। লেখার জন্য ওইভাবে ভাবাটাই কঠিন। আমি সেদিন বিভূতিভূষণের একটা গল্প পড়লাম হাজু বলে একটা মেয়েকে নিয়ে। মধ্যবিত্ত বাড়িতে গরীব মেয়েটি খাবার চাইতে আসত। পরে পতিতা হয়ে যায়। যে বাড়িতে খেতে চাইতে আসত সেই বাড়ির লোক হাজুকে বনগাঁ অঞ্চলে দেখতে পায়। বনগাঁয় কোন একটা কাজে গিয়েছিল সে। সেখানে দেখে যে একটা খোলার ঘরে এখন হাজু থাকে। হাজু তাঁকে দেখে বলে; 'জ্যাঠামশাই, আসুন'। তারপর নতুন চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়। বলে 'কাপগুলো ভাল হয়েছে না জ্যাঠামশাই?' অত্যন্ত সস্তার কাপ, অত্যন্ত সস্তার পিরিচ। এবং তার ওই যে উৎসাহ, যে একদিন খেতে পেত না, সে নিজে রোজগার করে বাঁচছে। পতিতা হয়ে গেছে সে। হাজুকে দেখে জ্ঞানের কথা শোনাতেই ইচ্ছে করছিল তার। বলতে ইচ্ছে করছিল 'এই পথে থাকা ঠিক নয়' ইত্যাদি। কিন্তু তার ওই আনন্দ এবং উৎসাহ দেখে সেই জ্যাঠামশাই স্বীকার করেন, 'হাজুর উৎসাহ, বাঁচার উদ্দীপনা দেখে আমি তেমন কিছুই ওকে বলতে পারলাম না'। এই যে অদ্ভুত অদ্ভুত মুহূর্ত তৈরি করেন বিভূতিভূষণ যেটা আসলে কেবলমাত্র স্থানিক এবং ভূগোলের মধ্যে থাকে অথচ ভূগোল বা ইতিহাসটা ছাড়িয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে চলে যায়। এই ধরনের লেখাই আমার মনে হয় যে

আবার পৃথিবীর মানুষ পড়তে চাইছে। যার ফলে বিভুতিভূষণকে আমার অমর বলে মনে হয়।

দেবাশিস রায় : আজকের আলাপচারিতায় বেরিয়ে এল যে আপনি পরে আরেকটি উপন্যাস লিখবেন ১৯৫৯ সালের পরের ইতিহাসকে নিয়ে। সেখানে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রে রাখা হবে। দুটো নির্দিষ্ট প্রশ্ন আমি রাখতে চাই। প্রথম প্রশ্ন, এরপর আপনার কি আরও উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আছে? সেই উপন্যাস যে থিয়েটারকেন্দ্রিকই হবে এমনটা নয়।

ব্রাত্য বসু : জীবনে আমার আরও দুটো উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আছে। একটা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আর একটা আমার রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। তবে নিয়মিত উপন্যাস লেখার বিষয়টা বলা যায় না। কখন কি হয় তা বলা যায় না।

(সবাই হাসেন)

দেবাশিস রায় : ভবিষ্যতে গল্প লেখার কোন পরিকল্পনা আছে?

ব্রাত্য বসু : মাঝখানে যে তিনটি গল্প লিখেছি তার সবগুলোই ফরমায়েশি। যদি কেউ লিখতে বলেন তখন ভাবব। যে গল্প লিখেছিলাম তা থিয়েটারের গল্প ছিল। থিয়েটার কেন্দ্রিক গল্পের আর একটি গুচ্ছ লেখার ইচ্ছে আছে।

অরিন্দম ঘোষ : 'অদামৃতকথা' এবং 'দ্যূতক্রীড়ক' এই দুটি উপন্যাসের যে সময়সারণী, তাতে আমরা যদি দেখতে দেখতে যাই তাহলে দেখব সবই মূল চরিত্রের থিয়েটারের ইতিহাস, নাগরিক কলকাতার থিয়েটারের ইতিহাস, তাহলে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারছি যে এই ঘটনাক্রম যা যা হয়েছে এবং পারস্পরিক যে রকম ক্ষোভ-বিক্ষোভ, দ্বন্দ্ব, নানা ধরনের শঠতা, কুটকচালি, রাজনৈতিকতা সবটাই আছে। এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা একটা জিনিস পড়তে পড়তে বুঝতে পারছিলাম যে, শিশির ভাদুড়ির সময়কালের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সাধারণ রঙ্গালয়ের নিশ্চিত অধঃপতন এবং রসাতলে যাওয়ার সমস্ত ইঙ্গিত আমরা সেখানে পেয়েছি। এবং পরবর্তীকালে, তাই হয়েওছে। ১৯৯১ সালে ওই স্টার থিয়েটার পুড়ে গেল। 'ঘটক বিদায়' চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল। এবং এর পরে পাশাপাশি যে থিয়েটারটা বর্তমানে চলছে তার শরিক আমরা। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এই বর্তমান সময়টা কি আপনার আগামী লেখায় আসতে পারে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, বর্তমান বাংলা থিয়েটারের অধঃপতন কি শুরু হয়েছে? নাকি নিমগাছে জোনাকির মত মিটিমিটি জ্বলছে?

ব্রাত্য বসু : এগুলো নিয়ে অন্য কেউ উপন্যাস লিখবেন। আমি লিখব না কেননা ওই সময়কালের মধ্যে আমি নিজে যুক্ত রয়েছি। ১৯৯১ সালে স্টার পুড়ে যাচ্ছে। ১৯৯৬ সালের বিশ্বরূপা, রঙমহল পুড়ে যাচ্ছে ২০০০ সালে। আবার ওই ১৯৯৬ সালে আমি প্রথম নাটক লিখছি। ১৯৯১ সালে আমাদের দেশে বিনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। আমরা মধ্যবিত্তরা এখন এই যে জিন্‌স্ পরে আছি এইসব নরসিমা রাও আর মনমোহন সিং-এর অর্থনৈতিক নীতির ফলে। লাইসেন্স রাজ উঠে যাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে। ইন্টারনেট ঢুকছে

১৯৯৫-তে আমাদের দেশে। এই বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলো আমরা পাচ্ছি। এক্সপোজার ঘটে যাচ্ছে। আগে একটা হলিউডের সিনেমা দেখা অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল, আগেকার সময়ে জর্জি গ্রোটস্কির লেখা, 'টুওয়ার্ডস দ্য পুওর থিয়েটার' কারও বাড়িতে থাকা মানে তার কাছে বিরাট একটা সম্পদ আছে বলে মনে করা হত। একটা বিরাট ট্রেজার লুকিয়ে রেখেছে বাড়িতে। এখন তো সেটা নয়। সবটার এক্সপোজার ঘটে গেছে। এসবের মধ্যে কী করে ভাল থিয়েটার হবে এবং সেটা পেশাদারি পন্থায় কীভাবে হবে তা আমার অন্তত জানা নেই। এসব নিয়ে নিশ্চয়ই অন্য কেউ লিখবেন।

অরিন্দম ঘোষ : অধঃপতন কি শুরু হয়েছে; আমাদের আজকের থিয়েটারে? আপনার কি মনে হয়?

ব্রাত্য বসু : আমি এইভাবে কোন ভ্যালু জাজমেন্ট দেব না। তবে আজকের থিয়েটারে ভাল কিছু ঘটছে না এবং ইদানীংকালে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেওনি।

অরিন্দম ঘোষ : কিন্তু থিয়েটার তো চলবে?

ব্রাত্য বসু : হ্যাঁ থিয়েটার চলতে থাকবে। নিমগাছে জোনাকির মত টিম টিম করে জ্বলবে। এখন থিয়েটার বেড়ে গেছে বেকার সমস্যা আছে বলে। তবে বেকার সমস্যা যদি নাও থাকে তাহলেও থিয়েটার থাকবে। থিয়েটারের জোর এতটাই। মানুষ প্রকাশ করবেই নিজেকে।

অরিন্দম ঘোষ : সাহিত্য নিয়ে এমন অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা ব্রাত্য বসুর সঙ্গে সম্ভবত আমাদের হয়নি।

দেবাশিস রায় : আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলব বলে স্থির করেছিলাম তা' হল, ব্রাত্য বসুর সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত 'অদামৃতকথা' এবং 'দ্যূতক্রীড়ক' নামের দুটো উপন্যাস নিয়ে। আমাদের আলোচনার মধ্যে সেই উপন্যাসের বিষয় তো এলই পরন্তু যে উপন্যাসটি অর্থাৎ 'উদ্বাসিত মান্দাস' এখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে তার কথাও এসেছে। এবং শুধু উপন্যাস নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের কথা এসেছে, সাহিত্যের অন্য অন্য প্রসঙ্গেও কথা হয়েছে। ব্যক্তিগত বিষয়ও উঠে এসেছে।

আমরা এতক্ষণ নাট্যব্যক্তিত্ব, কবি, প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা, রাজনীতিবিদ্ ব্রাত্য বসুর সঙ্গে আলাপচারিতায় রইলাম। কবিতার কথা, কথাসাহিত্যের বিষয়েও অনেক কথা তিনি বলেছেন। আমরা ঋদ্ধ হলাম এবং আমাদের পাঠকরা এই আলাপচারিতার অনুলিখন নিশ্চয়ই পড়বেন এবং আশা করি, তাঁরাও সমৃদ্ধ হবেন।

'উদ্বাসিত মান্দাস'-এর পরে থিয়েটারের আরও একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় চরিত্রকে নিয়ে তার পরবর্তী উপন্যাসের জন্য ব্রাত্য বসুকে জানাই আমাদের আগাম শুভেচ্ছা। আমাদের আজকের আলাপচারিতা এখানেই শেষ করছি।

(ব্রাত্য বসুকে) আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ব্রাত্য বসু : আপনাদেরও অনেক ধন্যবাদ।

অনুলিখন : স্বপন আঢ্য